কাশফুলের ছবি - বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

আমাদের ছুটি ইচ্ছে হলেই...

বেড়ানোর কথা আর ছবি নিয়ে বাংলা ই-ম্যাগাজিন

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা - ভাদ্র-আশ্বিন ১৪১৮

উৎসবের মেজাজ আকাশে -বাতাসে, নীল -সাদা মেঘে, এমনকী ঝিরঝিরে -ঝমঝমে বৃষ্টিতেও। উৎসব মানেই ছুটি – প্রতিদিনের ধরাবাঁধা জীবন থেকে – বেরিয়ে পড়া ঘরের বাইরে কিংবা হারিয়ে যাওয়া মনে মনেই জানা-অজানা পথে – পাহাড় থেকে সাগরে, লোকালয় থেকে অরণ্যে। সেই হারিয়ে যাওয়ার কথা আর ছবি নিয়েই "আমাদের ছুটি"-র এবারের সংখ্যা। বৈশাখে প্রথম সংখ্যা বেরোনোর পর থেকে গত কয়েকমাসে চেনা-অচেনা বন্ধুদের পাঠানো লেখায় - আঁকায় -ছবিতে ভরে উঠছে "আমাদের ছুটি"। পাঁচশো-র বেশি বেড়ানোর জায়গার তথ্য, একগুচ্ছ বেড়ানোর প্ল্যান ও জনা চল্লিশ আলোকচিত্রীর পাঠানো হাজারখানেক ছবি সংযোজিত হয়েছে আজ অবধি। আমাদের নিয়মিত পাঠকসংখ্যাও পাঁচশো ছাড়িয়ে ছশো ছুঁইছুঁই। কেমন লাগছে – "আমাদের ছুটি"? আরও আরও বন্ধুদের কাছ থেকে জানতে উৎসুক আমরা। "আমাদের ছুটি"-কে সাজিয়ে তুলতে আর কী কী চাই বা চাইনা -যেকোনরকম পরামর্শই লিখুন মতামতের পাতায়। নিয়মিত পাঠাতে থাকুন লেখা আর ছবি। অন্যদের কাছে পৌঁছে দিন "আমাদের ছুটি"-র ওয়েব ঠিকানা। আপনাদের আগ্রহই এগিয়ে নিয়ে যাবে এই প্রয়াসকে। আরও বেশি করে পাঠকের তোলা ছবি আর লেখাতেই সেজে উঠুক আগামী সংখ্যাগুলি। উৎসবের দিনগুলি ঘরে-বাইরে সবার ভালো কাটুক, আনন্দে কাটুক।

www.amaderchhuti.com

- দময়ন্তী দাশগুপ্ত

এই সংখ্যায়-

কথোপকথন

মাথা তুলে দাঁড়াবার এরকম দৃষ্টান্ত পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এর ওপর থেকে পৃথিবীটা দেখা এক অন্যরকম অভিজ্ঞতা - আশ্চর্য সেই অনুভবের কথা শোনালেন এ বছরের এভারেস্টজয়ী তিন বাঙালি পর্বতারোহী।

আরশিনগর

ছবিপটের ছায়ানটে - - অভীক আচার্য

এতবছরে মেলেনি কোনও সরকারি সাহায্য। তবু টালির ঘরে বসেও তিরিশ হাজার টাকার লোভনীয় প্রস্তাবের কাছে নতি স্বীকার করে দালালের কাছে বিক্রি করে দেননি তাঁর সংগ্রহের দেড়শো বছরের প্রাচীন পট। ঘনশ্যাম পটুয়ার বিচিত্র কথা শুনতে শুনতে আমরা লেখক-পাঠক মুখোমুখি হই নিজেদের।

পায়ে পায়ে পাহাড়ে - - বিশ্বনাথ মিত্র

রহস্যময়ী মানেভঞ্জন। বাইরের রাতে মেঘের ধোঁয়াশা। ওঠার পথে দুপাশে ম্যাপল আর ওক গাছের সারির স্যালুট। তারপর চিত্রে হয়ে টুমলিং -কালপোখরি। সবশেষে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি মাথায় সান্দাকফু। সারা আকাশ রাঙিয়ে সূর্য যখন ডুবছে স্বচক্ষে দেখতে পেলাম -লোৎসে আর মাকালুর ফাঁক দিয়ে সেই তাকে...

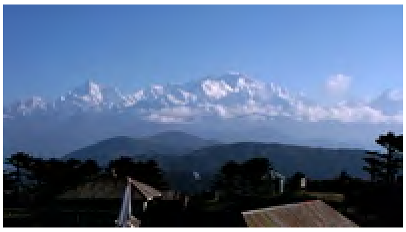

☐ সব পেয়েছির দেশ ☐

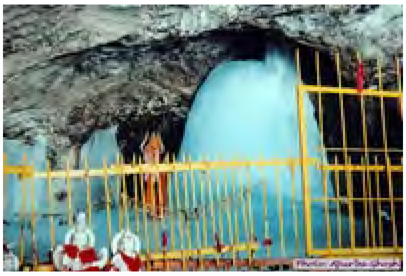

অমরনাথের ডায়েরি - - অপূর্ব ঘোষ

পহেলগাঁও থেকে বাসে বা গাড়িতে চন্দনবাড়ি পৌঁছে হাঁটা শুরু। ১১২০০ ফুট উঁচু পিসুটপের খাড়াই পেরিয়ে পৌঁছানো শেষনাগে। পরদিন ১৪৮০০ ফুট উচ্চতার মহাগুনাস পাসের কঠিন চড়াই ভেঙ্গে পঞ্চতরণীতে বিশ্রাম। অমরনাথ গুহায় পৌঁছানোর আগে এটাই রাত্রিবাসের শেষ ঠিকানা। এবছর অমরনাথ যাত্রা ছিল ২৯শে জুন থেকে ১৩আগষ্ট।

কবিতায় চড়ে বান্ধবগড়ে - - অভিষেক চট্টোপাধ্যায়

যে ঘর আমরা এসেছি ফেলে সেই সে আদিম সময়
জনঅরণ্যে মিললে ছুটি মন ছুটে যেতে চায়।
ধুলোর বুকে পায়ের চিহ্ন কলাপের রং ধরে
বাঘেলা রাজার বান্ধবগড় কবিতার রথে চড়ে।

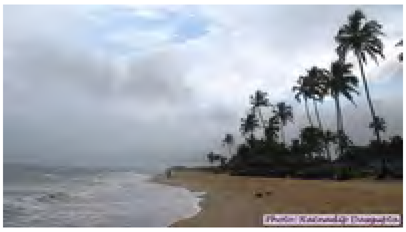

আকাশের কথা সাগরের কানে - - দময়ন্তী দাশগুপ্ত

সফেন-নীল সাগরের গানে মাঝেমধ্যেই মিশছে আকাশের অঝোর বিরহ। জলভেজা বালিপথে ছাপ ফেলে যাচ্ছে সাগরবিলাসী কিছু মানুষ। তীরছোঁয়া ইতিহাস ফিসফিসিয়ে ভাসছে কানের কাছে। ঢেউয়ের তালে শরীরি উষ্ণ ছোঁয়াচ, ওপাশে কাজু ফেনি উথলে ওঠে সূর্যাস্তের পেয়ালায়...

☐ ভুবনডাঙা ☐

www.amaderchhuti.com

ভলেনডাম - টুকরো গানের কলি - - মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

নেদারল্যান্ডসে আইজে নদীর তীরে শান্ত-স্নিগ্ধ ছবির মতো ছোট্ট গ্রাম ভলেনডাম। যেখানে আজও প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে মাঠে ফসল বোনেন গ্রামবাসীরা। জেলেরা মাছ ধরেন নদীতে আর সেই মাছ খেতে স্থানীয় মাছভাজার স্টলগুলোতে পর্যটকদের সঙ্গে ভিড় জমায় মৎস্যভুক পাখির দল।

☐ শেষ পাতা ☐

শুশুনিয়া পাহাড় আর এক টেনিদার গল্প - তীর্থঙ্কর ঘোষ

ঘুটঘুটে অন্ধকারে গোটা একটা গেস্টহাউসে একা থাকা আর শুশুনিয়ার জঙ্গলে হনুমানের আস্ত একটা ব্যাটেলিয়ানের মুখোমুখি হওয়া... তারপর?

ভাসছি রঙিন ক্যানভাসে - নীলাঞ্জন কুণ্ডু

দুটি রং মিশেছে এক পাত্রে। আর তাতে এসে পড়েছে পড়ন্ত সূর্যের আভা...বাংলার রূপ খুঁজতে রূপনারায়ণ আর হুগলীর তীরে গাদিয়াড়ায়।

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com

© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu

Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

কথোপকথন

১৯৫৩ থেকে ২০১১ - এভারেস্ট শৃঙ্গ জয়ের এই ৫৮ বছরের ইতিহাসে এখনো পর্যন্ত মাত্র আটজন বাঙালির নাম সফলের তালিকায় রয়েছে। ভারতীয় নৌসেনার তরফে ২০০৪ সালে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পর্বতারোহী কম্যান্ডার সত্যব্রত দাম এভারেস্ট শিখরে পা রাখেন। পরের বছর ২০০৫-এ ভারতীয় সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন শিপ্রা মজুমদার (এভারেস্টজয়ী প্রথম বাঙালি মহিলা) এভারেস্ট শীর্ষে ওঠেন। এরপর ২০১০ সালে দুই বাংলার তিন সিভিলিয়ান পর্বতারোহী - পশ্চিমবঙ্গের বসন্ত সিংহ রায় ও দেবাশীষ বিশ্বাস এবং বাংলাদেশের মুসা ইব্রাহিম এভারেস্টের চূড়ায় পৌঁছান। ২০১১ সালে আবারও দুই বাংলার তিন বাঙালি এভারেস্ট জয় করলেন।

‖ ~ এভারেস্ট অভিযানের ছবি ~ ‖

আড্ডা বসেছিল আমাদের। হ্যাঁ, আড্ডাই, ঠিক সাজানো গোছানো সাক্ষাৎকার নয়। আড্ডায় 'আমাদের ছুটি'-র মুখোমুখি এবছরের এভারেস্টজয়ী দুই বাঙালি দীপঙ্কর ঘোষ আর রাজীব ভট্টাচার্য - ঘন্টাদুয়েকের একটা জমাটি আড্ডায় উঠে এল দীপঙ্কর -রাজীবের ব্যক্তিগত আনন্দ -বেদনার নানান মুহূর্ত। আড্ডার মাঝে দূরভাষে/অনলাইনে হাজির এবছরের আর এক এভারেস্টজয়ী বাঙালি বাংলাদেশের এম. এ. মুহিত। মজার কথা হল তিনজনেই শিখরে পৌঁছেছিলেন একই দিনে - ২১ মে, ২০১১। তিন এভারেস্টজয়ীর অভিজ্ঞতায়, ভাবনায় সমৃদ্ধ হলাম আমরা।

www.amaderchhuti.com

◆ ২৪ আগস্ট আবার বেরিয়ে পড়ছেন, এবারে কোথায়, শুধু দুজনেই যাচ্ছেন?
দীপঙ্কর -হিমাচল প্রদেশের লাহুল-স্পিতিতে মণিরাং বলে একটা পিক আছে - ৬৫৯৩ মি উচ্চতা, এবার ওখানেই যাচ্ছি আমরা 'ভদ্রকালী পদাতিক' ক্লাব থেকে। আমরা দুজনে তো যাচ্ছিই। সবমিলিয়ে ন'জন।
◆ এভারেস্ট অভিযানের সময়ও কি আপনারা দু'জনেই ছিলেন নাকি আরও বড় দল ছিল? কত তারিখে এভারেস্ট সামিট করেন?
রাজীব -আমরা দুজনেই। সঙ্গে দুজন শেরপা ছিলেন, করমা শেরপা আর খুরবা শেরপা। আমরা যে এজেন্সির মাধ্যমে গেছি সেটা হল লোবেন এক্সপেডিশন। তার কর্ণধার লোবেন শেরপা খুবই ভালো মনের মানুষ। আমাদের লজিস্টিক, মরাল সবধরণের সাপোর্ট দিয়েছিলেন। দুজনে যাচ্ছি বলে আলাদা কোন সমস্যাই হয়নি।
২১ মে ২০১১, বেলা ১০টা ২০ মিনিটে ও ১০টা ৩৩ মিনিটে আমরা এভারেস্ট শীর্ষে পৌঁছাই।
◆ আপনারা দুজনে তো মনে হয় অনেকদিন ধরেই একসাথে এক্সপেডিশন করছেন, কীভাবে শুরু হল?
রাজীব -আমার সঙ্গে দীপঙ্করদার আলাপ হওয়াটা একটা ঘটনা। সময়টা ১৯৯৮ সাল। দীপঙ্করদারা সেবছর ভাগিরথী-২ অভিযানে যাচ্ছিল। আমি তখন ট্রেক করতাম। সেবারে যাচ্ছিলাম ধুমধারকান্দি ট্রেকে। দুন এক্সপ্রেস ছেড়েছে রাত্তির ১২টায়। আমি যে কুপেতে ছিলাম, তার পাশের কুপেতেই দীপঙ্করদা, রাজীব, প্রসেনজিত আর সনাতন ছিল। ট্রেনেই প্রথম আলাপ।
দীপঙ্কর (হাসতে হাসতে) -ওরে বাবা সে এক মজার কাণ্ড। দেখি স্যান্ডো গেঞ্জি আর লুঙ্গি পরে একটা ছেলে বসে আছে। সাধারণত মাউন্টেনিয়াররা রাস্তায় বেরোলে অন্তত লুঙ্গি পরে না। এদিকে রুকস্যাকের সঙ্গে টেন্ট আটকানো। আমরাতো চেপে ধরলাম, কোথায় যাবে? বলে কিনা হরিদ্বার। আমরা যত বলি, কেউ টেন্ট নিয়ে হরিদ্বার যায় না। তাও কিছুতেই বলবে না। এই করতে করতে আলাপ হল। যদিও তখনও কিন্তু আমাদেরকে ও ঠিক বিশ্বাস করছে না। কথায় কথায় জানলাম ওর সঙ্গী যে গাইডটি যাবে সে আমাদের চেনা। ওকে বলি লোকটা কিন্তু তেমন বিশ্বাসযোগ্য নয়। ওতো আমাদের পাত্তাই দিচ্ছে না। শেষ অবধি পৌঁছে দেখে লোকটি তার আগেই অন্য দলের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে।গেছে। তখন আমাদের কথা বিশ্বাস হল।
রাজীব -সেবারে আমরা একসঙ্গে প্রায় সাত-আট দিন ছিলাম, ঝালা পর্যন্ত। তারপর ফিরে এসে যোগাযোগটা রেখেছিলাম।

◆ এতো গেল আলাপ পর্ব। একসঙ্গে পথচলার শুরুটা কবে?
দীপঙ্কর -একটা মজার কথা বলি, রাজীব একা একা ট্রেক করত। আমরা বললাম, তুমি একা একা ট্রেক করবে? ও বলল, আমার একা একা ট্রেক করতেই ভালো লাগে। পিঠে একটা ছোট্ট ন্যাপস্যাক থাকবে, তাতে খালি জলের বোতল আর ক্যামেরাটা। কানে ওয়াকম্যান গুঁজে আমি পাড়ি দেব। আমাদের চারজনের দল ছিল। আমরা বললাম ট্রেক করে নিশ্চয় মজা আছে কিন্তু পাহাড়ে চড়ারও তো একটা অন্যরকম মজা আছে। একটা গ্রুপের সঙ্গে যাওয়া, একসঙ্গে অ্যাকটিভিটি শুরু করা কত কী। ট্রেকিংটা একটা জায়গায় গিয়ে শেষ হয়ে যায় আর এক্সপেডিশন শেষ হয় একেবারে পীকে পৌঁছে। আমরা সবাই মিলেতো ওকে এভাবে ইনস্পায়ার করছি। ওর খুব ভয় ছিল, আদৌ পারবে কিনা।
রাজীব - ১৯৯৯-এ আমি প্রথম এক্সপেডিশনে যাই, ভদ্রকালী পদাতিক থেকে, যোগিন পীকে। দীপঙ্কদার সঙ্গে ওটাই আমার প্রথম একসঙ্গে যাওয়া।
দীপঙ্কর - প্রথম যখন রাজীব এক্সপেডিশনে যায়, তখন বলে আমার জন্য একটা এক্সট্রা লোক নিতে হবে, আমার স্যাকটা কোনদিন আমি নিজে বইনি। লোক নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ওকে বলে দেওয়া হয়েছিল যে স্যাকটা তোমাকেই বইতে হবে। লোকটা সঙ্গে থাকবে, যদি খুব অসুবিধে হয় তবেই তুমি স্যাকটা তার পিঠে দেবে। যাইহোক ওর কোন অসুবিধা হয়নি। ভয়টা আস্তে আস্তে কেটে গেছে।
রাজীব - ১৯৯৮-এর পর থেকে আমি আর কোন ট্রেকেই পার্টিসিপেট করিনি। ট্রেকিং ব্যাপারটাই আমার হারিয়ে গেল। এক্সপেডিশনটাই ভালো লেগে গেল।
দীপঙ্কর - প্রথমে বছরে একটা করে এক্সপেডিশনে যেত। আমি বছরে তিনটে করে এক্সপেডিশনে যাই। তারপর বেড়ে দু'টো করে। আসলে ভালো লাগার জায়গাটা তখন তৈরি হয়ে গেছে।

রাজীব ভট্টাচার্যঃ বাড়ি কলকাতার বরানগরে, কাজ করেন একটি জুয়েলারি ফার্মে। নেশা পর্বতারোহণ। মুলতঃ যুক্ত রয়েছেন উত্তরপাড়ার 'ভদ্রকালী পদাতিক' এবং শ্রীরামপুরের 'অঙ্গন ছাড়িয়ে' মাউন্টেনিয়ারিং ক্লাবদুটির সঙ্গে। মানালি থেকে বেসিক ও অ্যাডভান্সড মাউন্টেনিয়ারিং কোর্স করেছেন। এভারেস্ট নিয়ে ১৮টার মত অভিযানে অংশ নিয়েছেন।

দীপঙ্কর ঘোষ - বাড়ি হাওড়া জেলার বেলানগর, পেশা সাপ্লাই বিজনেস, নেশা পর্বতারোহণ। মূলতঃ যুক্ত রয়েছেন উত্তরপাড়ার 'ভদ্রকালী পদাতিক' এবং শ্রীরামপুরের 'অঙ্গন ছাড়িয়ে' মাউন্টেনিয়ারিং ক্লাব দুটির সঙ্গে। ভারতের চারটি মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট - HMI, দার্জিলিং; WHMI, মানালি; JMI, কাশ্মীর এবং উত্তরাঞ্চল থেকে বিভিন্ন কোর্স করেছেন। এখনো পর্যন্ত এভারেস্ট নিয়ে মোট ৩৭টি এক্সপেডিশন করেছেন এবং মোট ২৫টি পীক ক্লাইম্ব করেছেন।

◆ পারব না, পারব না করতে করতে একেবারে এভারেস্ট! এতো দেখছি সাংঘাতিক ব্যাপার। আচ্ছা এভারেস্ট শীর্ষে ওঠা এটাতো যেকোনও পর্বতারোহীর কাছেই একটা স্বপ্ন। আপনাদের কাছে এই স্বপ্নপূরণটা ঠিক কী, শুধুই লক্ষ্যে পৌঁছোনো নাকি আরও অন্যকিছু? এভারেস্টের চূড়া থেকে নীচের পৃথিবীটাকে ঠিক কেমন লাগে?

রাজীব - আমাদের কাছে ব্যাপারটা কিন্তু শুধুমাত্র অ্যাচিভ করা বা টার্গেট ফুলফিল করা তা নয়। আসলে মাউন্ট এভারেস্ট একটা টার্গেট নয়, একটা স্বপ্ন। আর সেই স্বপ্নটাকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া।

দীপঙ্কর - ১৯২১ সালে প্রথম মাউন্ট এভারেস্ট এক্সপেডিশন শুরু হয়। ১৯৫৩ সালের ২৯ মে প্রথম ক্লাইম্ব হয়। এই যে এতবছর গড়িয়ে গেছে, কেন এত সময় লেগেছে? শুধু তাই নয় এরমধ্যেও দেখুন ১৯৫৩ থেকে ২০১০ -এতবছর লেগে গেছে সিভিলিয়ান বাঙালিদের মাউন্ট এভারেস্টের চূড়া স্পর্শ করতে। তাহলে এর মধ্যে কী রহস্য আছে? এই রহস্যটাই কিন্তু আমাকে কুরে কুরে খেত। সেই রহস্যটা উদ্ঘাটন করার জন্যই হয়তো মাউন্ট এভারেস্টকে এত ভালো লাগে।

এর ওপর থেকে পৃথিবীটা দেখা এক অন্যরকম অভিজ্ঞতা। ওপর থেকে বহু শৃঙ্গ দেখা যায়, সবগুলিই এভারেস্টের থেকে নীচে -এই ব্যাপারটা দারুণ ফিল করেছিলাম ওপর থেকে। সত্যি মাউন্ট এভারেস্ট একসময় ছিল টেথিস সাগরের নীচে, সমুদ্রের নীচ থেকে মাথা তুলতে তুলতে আজকে সে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। মাথা তুলে দাঁড়াবার এরকম দৃষ্টান্ত পৃথিবীর আর কোথাও নেই। মাউন্ট এভারেস্টের শীর্ষে মাথা নত করে এই কথাটাই মনে হচ্ছিল। আর নিজেদের খুব গর্বিত বলে মনে হচ্ছিল যে এখানে আমরা বাঙালি তথা ভারতবর্ষের মাথা কিছুটা উঁচু করার চেষ্টা করছি।

www.amaderchhuti.com

◆ স্বপ্ন দেখার শুরুটা ঠিক কবে থেকে? একেবারে ছোটবেলায় নাকি বড় হয়ে? অনুপ্রেরণা কে?

দীপঙ্কর - একেবারে ছোটবেলা থেকে বলব না, আমি ১৯৮৭ সাল থেকে পাহাড়ে যাচ্ছি, তখন আমার ২২ বছর বয়স। তখন মাথায় ছিল না যে এভারেস্ট ক্লাইম্ব করব। একদম যদি আক্ষরিক অর্থে স্বপ্ন দেখা বলেন যে মাউন্ট এভারেস্টে আমাকে যেতেই হবে, এই ব্যাপারটা আমার মাথায় এসেছে ২০০৬ সাল থেকে। ২০০৬ সালে কলকাতা থেকে মাউন্ট এভারেস্ট অভিযানের একটা ব্যবস্থা করা হচ্ছিল। আমিও সেখানে সিলেকটেড ছিলাম। ২০০৭-এ যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়নি। কিন্তু আমার মাথায় তখন ঢুকে গেল যে এবারে হোলনা ঠিক আছে, কিন্তু আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে আমাকে যেতেই হবে, যেভাবেই হোক। ২০০৯ সালে একবার অনেকটা এগিয়ে গিয়েও ফিরে এসেছিলাম। আলটিমেটলি ২০১১-য় গেলাম।

পাহাড়ে চড়ার ব্যাপারটায় বাবা-মা আমাকে ভীষণ ইনস্পায়ার করেছেন। ইনফ্যাক্ট আমার পাহাড়ে যাওয়ার শুরুর মধ্যে বাবা-মার একটা অনুদান আছে। ১৯৭৫ সালে আমার বাবা-মা যখন অমরনাথে যান, আমাকে নিয়ে যাননি। তখন আমার মনে হয়েছিল যে বড় হয়ে প্রথমে আমি অমরনাথেই যাব। একটা জেদ চেপে গিয়েছিল। ১৯৮৭ সালে আমি ও আমার এক বন্ধু দু'জনে অমরনাথ যাই-সেই আমার প্রথম পাহাড়ে ট্রেক।

এভারেস্টে যাওয়ার আগেওতো অনেকেই বাবা-মাকে পরামর্শ দিয়েছেন, অনেকতো হলো, বয়স হচ্ছে, এবারে ওর পাহাড়ে যাওয়াটা বন্ধ কর। ওনারা বরং উলটে বলতেন যে ওর পাহাড়ে যাওয়া বন্ধ হলে অনেক বন্ধুর যাওয়াও বন্ধ হয়ে যাবে, সেটা উচিত নয়।

রাজীব - ১৯৯৯ সালে যখন এক্সপেডিশনে যোগ দিই, বিভিন্ন কোর্সগুলি করি তখন থেকে মনের মধ্যে সুপ্ত একটা আশা ছিল যে যদি কখনো মাউন্ট এভারেস্ট যাওয়ার সুযোগ পেতাম। স্বপ্নটা দেখতাম ঠিকই কিন্তু আমাদের মতো মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির কাছে অর্থের যোগানটাই বড় দুঃস্বপ্ন। যার ফলে স্বপ্নটা মনের একটা কোণায় খুব ছোট করেই থাকত। আমি টার্গেট কোনদিনই করিনি। গতবছর অক্টোবর মাসে যখন শুনলাম দীপঙ্করদা যাচ্ছে তখন ওকে গিয়ে বললাম যে তুমি যাচ্ছ, আমারও ইচ্ছে রয়েছে কিন্তু টাকার কী ব্যাপার? টাকার অঙ্কটা শুনে ওকে বললাম, তোমাকে তিনদিন বাদে জানাবো। বাড়িতে গিয়ে মাকে বলতে, মা প্রথমেই বললেন যে, দীপঙ্কর যাচ্ছে, তুই যাবি? যাবি, কিন্তু বাবা, বেশি কারোর কাছ থেকে কিছু ধার করিস না। আমার যে গয়নাগুলো আছে, সেগুলো বেচে দিয়ে তুই চলে যা। এবং বাস্তব সত্য হচ্ছে যে আমরা লোবেনকে যখন প্রথমবার অ্যাডভান্স করি, তখন একটা লিখিত এগ্রিমেন্ট হয়। তাতে প্রাথমিকভাবে আমরা পঞ্চাশহাজার টাকা দিয়েছিলাম। সেটা মায়ের গলার সোনার চেনটা বিক্রি করে। আমার পাহাড় যাওয়ার অনুপ্রেরণা কিন্তু মা। তারপর পারিবারিক সাপোর্টতো রয়েইছে। বন্ধুবান্ধব, ক্লাবের সবাই - নিঃস্বার্থ পরিশ্রম করে পুরো পরিকাঠামোটা তৈরি করেছে, নইলে কিছুই হতো না। আমারতো মনে হয় এভারেস্ট ক্লাইম্বিং-এ আমাদের যত না পরিশ্রম হয়েছে তার থেকে এই পরিকাঠামো তৈরি করতে আমাদের দুই ক্লাবের (ভদ্রকালী পদাতিক ও অঙ্গন ছাড়িয়ে) সদস্যদের বেশি পরিশ্রম হয়েছে।

(এবারে মুহিতও যোগ দিলেন এই আড্ডায়)

মুহিত -পাহাড়ে চড়তে ভালো লাগাটা আমার অনেকদিনেরই। আমাদের দেশেতো কোন পর্বত নেই, কিন্তু পাহাড় আছে পার্বত্য আসাম, মিজোরাম, চট্টগ্রাম ওই এলাকা ধরে। আমাদের উঁচু উঁচু পাহাড়গুলোয় যখন চড়ে ফেললাম তখন ইচ্ছা জাগল আরও উঁচু পাহাড়ে উঠতে। ইনাম আল হকের নেতৃত্বে ছয় সদস্যের বাংলাদেশের দলে আমি ২০০৪ সালে এভারেস্ট বেস ক্যাম্প অভিযানে যাই, এভারেস্টকে কাছ থেকে দেখবার জন্য। তখনই এভারেস্টে ওঠার ইচ্ছাটা প্রথম জাগে। বলা যায় স্বপ্ন দেখার শুরুটা তখন থেকেই।

ইনাম আল হকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এই মানুষটি আমাকে স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছেন। কিভাবে সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে হয় সেই পথও দেখিয়েছেন। তিনি আমাদের সত্যিকারের হিরো। পাখি প্রেমিক, অ্যান্টার্কটিকা ও সুমেরু অভিযাত্রী প্রথম বাংলাদেশি ইনাম আল হকের কাছেই আমার বার্ড ওয়্যাচিং , ট্রেকিং ও ফটোগ্রাফির হাতেখড়ি।

◆ অভিযানের প্রস্তুতির ব্যাপারটা কবে থেকে শুরু হয়েছিল? কীভাবে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন?

মুহিত - প্রস্তুতিতো একটা লম্বা ব্যাপার। পর্বতারোহণে উচ্চতাজনিত সমস্যা একটা বড় বাধা। আবার যত বেশিবার মাউন্টেনে যাওয়া যায় ততই বডি দ্রুত অ্যাক্লেমাটাইজড হয়। এইজন্যই বছরে দু'বার করে প্রত্যেক বছরেই আমি আমি পর্বতারোহণে যাই। এছাড়াও রোজ সকালে পাঁচ কিলোমিটার জগিং করি, ফ্রি হ্যান্ড করি। মাঝেমধ্যেই লম্বা হাঁটা দিই বিশ, পঁচিশ, তিরিশ কিলোমিটার। ট্রেক করতে বেড়িয়ে পড়ি। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আমাদের পাহাড়গুলোয় ট্রেকিং করি। একটু একটু করে উচ্চতা বাড়িয়েছি। প্রথমে ৬০০০ মিটারের একাধিক পিক, তারপর ৭০০০ মিটার এভাবে।

রাজীব - আলাদা করে কোন ট্রেনিং নেওয়া হয়নি, সারাবছরইতো প্র্যাকটিস করি। শুধু আমরা যে মাল্টিজিমে প্র্যাকটিস করতাম, এবারে কিছু অন্যরকম প্র্যাকটিস করেছিলাম।

দীপঙ্কর -আসলে প্রস্তুতির একটা প্রধান ব্যাপারই হল টাকা। এভারেস্ট অভিযানে আমাদের ক্ষেত্রে প্রথম এবং শেষ যে বাধাটা সবসময় অনুভব করেছি, এখনও করি সেটা হল টাকাপয়সার ব্যাপারটা। আমাদের দু'জনের জন্য মোট তিরিশ লাখ চুয়াত্তর হাজার টাকা খরচ হয়েছে। এটাতো নট্ এ ম্যাটার অব জোক। এত টাকাটা কোথা থেকে জোগাড় করব? রাজীব অনেক পরে এসেছে। কিন্তু আমি ওইযে ২০০৬-এর থেকে লড়ে যাচ্ছি সেটা সবসময় মাথার মধ্যে কুরে কুরে খাচ্ছে অথচ টাকার জোগাড় করতে পারছি না। নিজের কোমরেও অত জোর নেই। একটা সময় সত্যি মনে হয়েছিল যে আমার একটা চোখ আর একটা কিডনি কারোর কাছে বাঁধা রেখে চলে যাব। বন্ধুরাতো বলেছিল তুই পাগল হয়ে গেছিস। আমার কিন্তু মনের মধ্যে জেদটা চেপে গিয়েছিল, যে ২০১১-র মধ্যে আমাকে যেতেই হবে। পরবর্তীকালে আমার অনেক বন্ধু সৌম্য মুখার্জী, মানব লাহিড়ী, কে এন পন্ডিত আরও অন্যান্যরা সবাই বলল তুই এগো, আমরা আছি। গতবছর আগস্ট মাসে শ্রীরামপুরের 'অঙ্গন ছাড়িয়ে' আর উত্তরপাড়ার 'ভদ্রকালী পদাতিক' -এই দুই ক্লাবের সদস্যরা বললেন যে আমরা পেছনে আছি, দেখছি কীভাবে কী করা যায়। তখন আমি কনফিডেন্ট যে এত মানুষ যখন পেছনে রয়েছেন তখন নিশ্চয়ই একটা কিছু ব্যবস্থা হবে। তখন একেবারে পুরোপুরি ঝাঁপ দিই।

এম এ মুহিতঃ বাড়ি বাংলাদেশের ঢাকায়। বাংলাদেশের প্রথম পর্বতারোহণ ক্লাব -বাংলা মাউন্টেনিয়ারিং অ্যান্ড ট্রেকিং ক্লাবের সভাপতি মুহিতের ভালোলাগার তালিকায় রয়েছে বার্ড ওয়াচিং আর ফটোগ্রাফি। হিমালয়, বাংলাদেশের পাহাড় ও উপকূল নিয়ে তাঁর দুটি একক ও তিনটি যৌথ আলোকচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৯৭ সাল থেকে যুক্ত রয়েছেন বাংলাদেশের বার্ড ক্লাবের সঙ্গে এবং দেশের পাখি সমৃদ্ধ অঞ্চলে পর্যবেক্ষণ ও গণনায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করে আসছেন।

◆ এক্সপেডিশনের জন্য সরকারি বা বেসরকারি কোনরকম স্পনসর বা সাহায্য কিছু পাননি?

দীপঙ্কর -ফিরে আসার পর নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে একটা সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছিল তখন পঁচিশ হাজার টাকা করে আমাদের দেওয়া হয়। এছাড়া কোন টাকাই আমরা পাইনি। পশ্চিমবঙ্গে কতদূর কী হবে জানিনা। প্রায় ২৩ লাখ টাকা এখনো আমাদের ধার আছে। বন্ধুবান্ধবেরা বিনা সুদে আমাদের ধার দিয়েছে। তারা বলেছে, ঠিক আছে তোরা ফিরে আয় তারপরে দেখা যাবে। এখনোপর্যন্ত কেউ একটা টাকাও ফেরত চায়নি।

এর ঠিক উল্টোদিকটা বলি, গেলবছর মমতা সোধা বলে হরিয়ানার একটি মেয়ে ক্লাইম্ব করেছিল। হরিয়ানা সরকার থেকে তাকে একুশ লাখ টাকা আর ডি এস পি-র পদে চাকরি দেওয়া হয়। এই বছর মমতাকে তেনজিং নোরগে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে। আমরা কিন্তু চাকরি পাওয়ার জন্য, টাকা পাওয়ার জন্য কিম্বা পুরস্কারের লোভে ক্লাইম্ব করিনি। ওটা মনের ইচ্ছা ছিল, গেছি। কিন্তু সমাজকে আমরা যদি কিছু দিই তাহলে সমাজ থেকে আমাদেরওতো কিছু প্রাপ্য হতে পারে, তাই না?

www.amaderchhuti.com

মুহিত -টাকাপয়সার ব্যাপারটা আমাদের ক্ষেত্রে সমস্যার হয়না, কারণ আমরা বিভিন্ন অভিযান স্পনসরের মাধ্যমে করি। 'মাউন্টেন ভিউ' নামে একটি কোম্পানী আমাদের শুরু থেকেই স্পনসর করছে। এছাড়াও কিছু কিছু অন্যান্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান আমাদের স্পনসর করেছে। তবে সরকার থেকে কোনও অর্থ সাহায্য পাইনি।

◆ পরপর দুজনের এভারেস্ট জয়ের পর বাংলাদেশ সরকার পর্বতারোহণ বিষয়টি নিয়ে কী ভাবনাচিন্তা করছেন?

মুহিত -পর্বতারোহণ ব্যাপারটাই আমাদের দেশে মাত্র কয়েক বছর হল শুরু হয়েছে। হাতে গোনা পঁচিশ-তিরিশজন ট্রেনিংপ্রাপ্ত পর্বতারোহী আছেন যারমধ্যে পাহাড়ে যাচ্ছেন হয়তো দশজন। নিয়মিত পর্বতারোহণ করি আমি একাই। এইসব কারণে সরকারের মাথাব্যথা নেই -এভারেস্ট জয়ের পরও। বেসরকারি সংস্থাগুলোই সহযোগিতা করে।

◆আপনারা কোন পথে শীর্ষে আরোহণ করেন? এই পথটাই বেছে নিলেন কেন?

দীপঙ্কর - শুধু এভারেস্ট নয় যেকোন চূড়ায় ওঠার ক্ষেত্রেই অনেকেরই ইচ্ছা থাকে কঠিন পথটা দিয়ে উঠব, এটা একটা চ্যালেঞ্জ। এই করতে করতেই পনেরটা পথ দিয়ে এভারেস্ট ক্লাইম্ব হয়ে গেছে। আমরা যেটায় গিয়েছিলাম সেটা একেবারেই ট্র্যাডিশনাল রুট। প্রথম থেকেই আমার মাথায় ছিল যে স্যার এডমন্ড হিলারি এবং তেনজিং নোরগে যে রুট দিয়ে গিয়েছিলেন সেই পথেই যাব। যেহেতু ওঁদের বইগুলো এতবার পড়েছি, এত ভালোলাগে - দেখব তাঁদের যে চিন্তাভাবনা-দেখা, তার সঙ্গে আজকের এভারেস্টটা মিলছে কিনা। নিজে গিয়ে দেখলাম তাঁরা যে যে জায়গাগুলো দিয়ে ক্লাইম্ব করেছিলেন সেই জায়গাগুলো কিন্তু আজও একইরকমই আছে। সেটা দেখাও আমার একটা কৌতূহল ছিল। এই রুটটা নেপাল দিয়ে - সাউথ কল বলা হয়, ২৬,০০০ ফিট উচ্চতায়। সাউথ কল হয়ে সাউথ ইস্ট রিজ ধরে, আজকের হিলারি স্টেপ দিয়ে ক্লাইম্ব করা।

মুহিত -আমি ২০১০ সালে এপ্রিল-মে মাসে তিব্বত (নর্থ ফেস) দিয়ে প্রথম বাংলাদেশি হিসাবে এভারেস্ট অভিযানে অংশ নিই। কিন্তু বিরূপ আবহাওয়া ও শেরপার ভুল সিদ্ধান্তের কারণে সেবার ক্যাম্প-১ থেকে আমাকে ফেরত আসতে হয়েছে। এবছর ৮ এপ্রিল বাংলাদেশ থেকে নেপালের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করি। ইচ্ছা ছিল নেপালের দিক দিয়ে আরোহণ করার। কিন্তু পীক রয়ালটি এবং পারমিশনের জটিলতার কারণে বাধ্য হয়ে তিব্বত দিয়ে অনুমতি নিলাম।

◆হিমালয় -এভারেস্ট এর মানেইতো নানান ধরণের প্রতিবন্ধকতা - ক্লিভার্স, স্নো বাইট, চোখ ঝলসানো বরফের পাহাড় - কোন মুহূর্তে নিজেকে অসহায় মনে হয়নি? সাংঘাতিক কোন অভিজ্ঞতার কথা কি মনে পড়ছে?

দীপঙ্কর -অসহায় সেইসময় মনে হয় যখন নিজেরা কোন বিপদের মধ্যে পড়ি। এবারেও আমরা বহু বিপদের মুখে পড়েছি, বিশেষ করে যে বিপদগুলোর ওপরে আমাদের কোন হাত নেই অর্থাৎ ন্যাচারাল ক্যালামাইটি সেগুলোই মারাত্মক। ক্লিভার্স ঠিক আছে, তার রুট ওপেন করা হয়েছে-হচ্ছে, কিন্তু বিশেষ করে যখন আবহাওয়া খুব খারাপ হয় তখন যে হ্যাজার্ডগুলো আসে - প্রকৃতির কাছে আমরা যে সত্যিই কত ক্ষুদ্র, যেকোন সময় খড়কুটোর মত উড়ে যেতে পারি সেটা পদে পদে অনুভব করতে হয়। মাউন্ট এভারেস্টের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের সব গর্বই ছুটে যায়। খালি মনে হয় ভগবান আমাকে বাঁচাও।

আমাদের এবারে অনেক জায়গাতেই বিপদে পড়তে হয়েছিল। ১২ মে আমরা ভীষণ একটা তুষারঝড়ের মধ্যে পড়েছিলাম। বীভৎস একটা হাওয়া চলছিল। ১৫ মে আমরা আবার বেসক্যাম্পে ফিরে আসি। প্রায় ২৫,০০০ ফিট থেকে একদম সোজা নীচে। ওইসময় আমাদের সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের বহু পর্বতারোহী ক্লাইম্ব করতে গিয়েছিলেন। অনেকে দেশেও ফিরে যান, কিন্তু আমরা মাটি আঁকড়ে পড়ে ছিলাম। করবই এই ভাবনা থেকেই আমরা শেষপর্যন্ত ২১ তারিখে সামিট করি।

Photo Courtsey: M. A. Muhit

মুহিত -২১ মে ভোর ৩টে নাগাদ প্রায় ৮,৬১০ মিটার উচ্চতায় সেকেন্ড স্টেপ নামের দ্বিতীয় হার্ডল-এ পৌঁছেছি। প্রায় ৪০ ফুট খাড়া পাহাড়ের দেওয়াল। সেকেন্ড স্টেপ পার হওয়ার পর কয়েকটা মৃতদেহ পরে থাকতে দেখলাম। তখন তাপমাত্রা মাইনাস ৩৫ ডিগ্রী। হঠাৎ করেই জোরে বাতাস বইতে লাগলো। ঠান্ডা বাতাস চোখে লাগামাত্র ঝাপসা দেখতে লাগলাম। তখন কিছুটা শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম। তবে আমার মনোবল ছিল যে ঠিকই আমি চূড়ায় আরোহণ করতে পারবো। ভোর ৫টার দিকে আমি যখন প্রায় ৮,৭১০ মিটার উচ্চতায় এভারেস্টে আরোহণের তৃতীয় বড় বাধা থার্ড স্টেপে পৌঁছাই তখন কানে এলো কে যেন চিৎকার করছে ‘হেল্প হেল্প’ বলে। আমার ভেতরটা মুচড়ে উঠলো। আমি থার্ড স্টেপের অপর পাশে পৌঁছাতেই দেখলাম উচ্চতা জনিত অসুস্থতা ও অক্সিজেন স্বল্পতার কারণে আয়ারল্যান্ডের এক পর্বতারোহী মারা গেছেন। থার্ড স্টেপ হল ২০-২৫ ফুট খাড়া খাড়া এবড়ো-খেবড়ো পাথরের একেকটি স্তম্ভের মত। সেই পাথরের ভাঁজে ভাঁজে চলতে হয়। একেতো চোখের ঝাপসা দেখছি। তার ওপর ওই লোকটাকে চোখের সামনে মারা যেতে দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। তবে তারপরেও হার মানিনি। শেষপর্যন্ত ২১ তারিখ সকাল ৭টায় এভারেস্টের শীর্ষে পৌঁছাই।

◆ অতটা ওপরে ওঠা, একেবারে পৃথিবীর মাথায়, অ্যাক্লেমাটাইজ করলেন কীভাবে?

রাজীব -সবমিলিয়ে আমরা চারবার ওঠানামা করেছি। এটার একটা পদ্ধতি আছে। প্রথমে ১৭,৬০০ ফিট উচ্চতায় বেসক্যাম্প থেকে ক্যাম্প ওয়ানে যেতে হবে আবহাওয়ার সংগে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য। ওখানে এক রাত থাকা হয়। ক্যাম্প-১ হচ্ছে ২০,০০০ ফিট উচ্চতায়। সেখান থেকে আরেকটু উঠে ক্যাম্প-২ এর কাছাকাছি অর্থাৎ ২২,০০০ ফিট থেকে আবার একইদিনে বেসক্যাম্পে নেমে আসি। তিন-চারদিন বিশ্রাম নিয়ে আমরা এবার সোজা চলে যাই ক্যাম্প-২-এ ২২,০০০ ফিটে। সেখানে দু'দিন বিশ্রাম নিয়ে আবার ২৪,০০০ ফিট উচ্চতায় ক্যাম্প-৩। আবার নেমে আসি বেসক্যাম্পে। তারপর ফাইনালি সামিট করবার জন্য বেরিয়েও ১২ তারিখের খারাপ আবহাওয়ার জন্য ১৫ তারিখে বেসক্যাম্পে ফিরে আসি। শেষ পর্যন্ত চতুর্থ বারে অর্থাৎ ১৮ মে সরাসরি বেসক্যাম্প থেকে ক্যাম্প-২, পরেরদিন ১৯ মে ক্যাম্প-৩, ২০ মে ক্যাম্প-৪ আর ২১ তারিখ সামিট করি।

◆এভারেস্টের চূড়ায় জাতীয় পতাকাটা পুঁতে দেওয়া - এটাতো জীবনের একটা চরম আনন্দের মুহূর্ত, এটা ছাড়া আপনার কাছে তেমন আনন্দের মুহূর্ত কি কিছু আছে?

রাজীব -একটা অভিযানের সময় যতক্ষণ জাতীয় পতাকাটা আমাদের সঙ্গে থাকে ততক্ষণ একটা অন্যরকম অনুভূতি থাকে যে একটা মহৎ উদ্দেশ্যে জাতীয় পতাকাটা নিয়ে যাচ্ছি। সারা পৃথিবীর কাছে আমরা ভারতবর্ষের প্রতিনিধি। এটাতো একটা ভীষণ গর্ব, ভীষণ ভালোলাগার একটা জায়গা। কিন্তু এই পুরো এক্সপেডিশনটার সময়ই আরও একটা কথা বারবার আমাদের মনে হচ্ছিল। বন্ধুবান্ধবেরাতো যে যা পেরেছেন আমাদের সাহায্য করেছেনই এমনকী যেসব বাচ্চাদের আমরা ক্লাব থেকে নেচার স্টাডি ক্যাম্পের ট্রেনিং দিই তারাও নিজেদের টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে আমাদের হাতে টাকা তুলে দিয়েছে। এই ফিলিংসটা চিন্তা করতে পারবেন না। আমরা যে সময়টা বেসক্যাম্পে থাকতাম তখন সবার সঙ্গে যোগাযোগ হতো। বাচ্চাগুলো ফোন করত, এস.এম.এস. করত, যে স্যার আপনাদের যেতেই হবে, আমরা অপেক্ষা করছি, আপনাদের আনন্দটার ভাগিদার কিন্তু আমরাও, আপনারা প্লিজ চেষ্টা ছাড়বেন না। এই ব্যাপারটা কিন্তু ভীষণ ইনস্পায়ার করেছিল। শেষপর্যন্ত আমরা যখন পৌঁছালাম তখন প্রথমেই মনে হয়েছিল যে বাচ্চাগুলো আনন্দ পাবে, আরও অনেকেই তো পাবেনই। বাবা-মা, বন্ধু-বান্ধব সবার কথা খুব মনে পড়ছিল।

মুহিত -এভারেস্টের চূড়ায় উঠে মিংমা ও দা কি শেরপাকে জড়িয়ে ধরে আমি আনন্দে কেঁদে ফেলি। সেইসময় সবকিছু ছাপিয়ে শুধু আমার দেশের কথাই মনে পড়েছিল। এভারেস্টের চূড়ায় পা দিয়েই আমার মনে হয়েছে আমি পৃথিবীর রাজা এবং আমার প্রিয় বাংলাদেশ এখন বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু আসনে। এভারেস্টে দেশের লাল সবুজ পতাকা ওড়াতে পেরে মনে হয়েছে আমি ষোল কোটি মানুষকে গর্বিত করতে পেরেছি। এর থেকে বেশি আনন্দের আর কিছু নেই আমার কাছে।

দীপঙ্কর -অনেকটা আনন্দের সঙ্গে মানুষের হয়তো কিছু দুঃখের মুহূর্তও মিশে যায়। সেইসময় আমার খুব বাবার কথা মনে পড়েছিল। গত ১৫ জানুয়ারী আমার বাবা মারা যান আর আমরা ১ এপ্রিল রওনা দিয়েছিলাম। হয়তো জানলে খুবই গর্বিত হতেন- খুশি তো হতেনই। আমার সৌভাগ্য যে মা অন্তত জেনে যেতে পেরেছেন। আমরা ফিরে আসি ৩১ মে, মা মারা যান ২৮ জুন। আমার এই সাফল্য আমি বাবার প্রতি উৎসর্গ করি।

www.amaderchhuti.com

Photo Courtsey: Dipankar Ghosh

◆দুই বাংলা মিলিয়ে মোটামুটি একবছরের মধ্যে ছয় বাঙালির এভারেস্ট জয়, এটা কেমন লাগছে?

দীপঙ্কর -এটা দারুণ লাগছে। গতবছরের আগে অবধি অনেক বয়স্ক মাউন্টেনিয়ারকেই বলতে শুনেছি যে তাহলে কি আমরা সিভিলিয়ান বাঙালি এভারেস্টজয়ী দেখে যেতে পারব না? তার মানে তখন অবধি ছিল, বাঙালিরা কেন পারছেনা? আমরা কি সক্ষম নই? হঠাৎ করে একবছরের মধ্যে এতজনের এভারেস্ট ক্লাইম্ব করাটা কিন্তু দারুণ এনজয় করছি। যে না তাহলে আমরাও পারি। যদি সরকার এবং সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে পাহাড়ে চড়ার ব্যাপারটাকে আরও প্রোমোট করা হয় তাহলে বাঙালি শুধু এভারেস্ট কেন পৃথিবীতে যে চোদ্দটা মোট ৮,০০০ মিটারের ওপর পিক আছে, তার সবকটাই জয় করতে পারবে।

◆এভারেস্টের শিখর আরোহন ক্রমেই এত জনপ্রিয় হচ্ছে যে আগামী দশ বছর পর্যন্ত কোন কোন দল যাবে তাও ঠিক হয়ে আছে। আবার চীন সরকার, নেপাল সরকারের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে বেসক্যাম্প পর্যন্ত হাইওয়ে করতে আগ্রহী। এতসব কান্ডে এভারেস্ট কি সহজলভ্য হয়ে যাচ্ছে?

দীপঙ্কর -অনেকেরই মনে এই প্রশ্নটা আসছে যে এভারেস্ট সহজলভ্য হয়ে যাচ্ছে কিনা। আমাদের কিন্তু মনে হয়েছে এভারেস্ট যেমন ছিল ঠিক তেমনই আছে। কারণ বেসক্যাম্প পর্যন্ত ট্রেকিংটা সাধারণ মানের। সাধারণ ট্রেকাররা যে পর্যন্ত যান সেটা কিন্তু অরিজিনাল বেসক্যাম্প নয়। চিনের দিক থেকে বেসক্যাম্প পর্যন্ত গাড়ির রাস্তাতো আছেই, নেপালের দিক থেকে হলেই বা ক্ষতি কী? মাউন্ট এভারেস্টের প্রধান যে বাধা খুম্বু আইসফল, সেখানে তো আর রাস্তা করা যাবে না। পাহাড়ের গায়ে যে ঢালগুলো সেগুলোতো একইরকম আছে। ওখানকার ক্লাইমেটিক কন্ডিশন, বরফের প্রকৃতি, উচ্চতা সবই একইরকম আছে। আমরাতো কয়েকমাস আগেই ক্লাইম্ব করেছি। আসলে এভারেস্ট ইজ এভারেস্ট। একে সহজলভ্য করা খুব মুশকিল। যদি সহজলভ্যই হত তাহলে এবছরেও যে তিনজন মারা গেছেন, সেটা কেন হল? আরও বড় কথা ২৪৮ জন এবারে ক্লাইম্ব করতে এসেছিলেন, ৭১ জন করতে পেরেছেন। বাকিরা পারলেন না কেন? যদি টাকা বা টেকনিকাল সুবিধা দিয়েই এভারেস্ট ক্লাইম্ব করা সহজ হত তাহলে সাকসেস রেট এত কম কেন?

◆শিখর থেকে নামার সময় বোঝা হালকা করতে অনেকেই টেন্ট, রুকস্যাক এসব ফেলে আসেন হিমালয়ের বুকে। দূষণের এই চিত্রটা ঠিক কেমন বলে মনে হল? আপনারা কী করেছেন?

রাজীব -এভারেস্ট এক্সপেডিশনের ক্ষেত্রে নেপাল গভর্নমেন্ট একটা বড় অঙ্কের টাকা জমা রাখেন কশান মানি হিসেবে। নন বায়োডিগ্রেডেবল সমস্ত জিনিস নীচে নামিয়ে এনে একটা ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট না পাওয়া পর্যন্ত টাকাটা আটকে রাখা হয়। একটা সময় ছিল যে এভারেস্ট একটা জাঙ্ক ইয়ার্ড হয়ে গিয়েছিল। এখন কিন্তু অভিযাত্রীরা অনেক সচেতন হয়েছেন। প্রথম কথা হচ্ছে মন থেকে ভালো লাগা যে হিমালয়কে পরিষ্কার রাখতে হবে। দূষণ বাড়লে উষ্ণায়নের ফলে কুফল আমাদেরই ভুগতে হবে। অতগুলো টাকা বাজেয়াপ্ত হবে এটাও একটা ব্যাপার। একটা র‍্যাপার পর্যন্ত আমরা পকেটে করে নামিয়ে আনি। এমনকি ওপর থেকে টয়লেটও নামিয়ে আনতে হয়। সুতরাং নোংরা করার কোন জায়গা নেই। বেসক্যাম্পেও বিন্দুমাত্র গারবেজ দেখতে পাবেন না। ওখানকার একটি এজেন্সি আছে সাগরমাতা পলিউশন কন্ট্রোল কমিটি (SPCC)। তারা সারাক্ষণ নজর রাখে।

◆আগামীদিনে যাঁরা এভারেস্টের শিখর ছোঁয়ার স্বপ্ন দেখেন পাহাড়পথের যাত্রী সেইসব মাউন্টেনিয়ার্সদের জন্য আপনাদের পরামর্শ।

দীপঙ্কর -আমাদের এখানে এভারেস্ট অভিযানের প্রধান বাধা টাকা-পয়সা। পশ্চিমবঙ্গে বহু মাউন্টেনিয়ার আছেন যাঁরা এভারেস্ট ক্লাইম্ব করতে সক্ষম। কিন্তু টাকাপয়সার জন্য পিছিয়ে যান। কিন্তু সত্যি যদি কোমর বেঁধে নেমে পড়া যায় তাহলে কিন্তু সম্ভব। আগামীদিনে যাঁরা এভারেস্ট যেতে চান তাঁদেরকে আমরা এটাই বলতে পারি।

মুহিত - আমি মনে করি বাংলাদেশের তরুণরা পারে না এমন কোন কিছু নেই। শুধুমাত্র দিকনির্দেশনা ও পৃষ্ঠপোষকতা থাকলেই তা সম্ভব। সবাইকে এভারেস্ট জয় করতে হবে এমন নয়। প্রত্যেকের মাঝে যেসব ইতিবাচক দিক রয়েছে সেগুলোর বিকাশ ঘটিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

◆ এভারেস্টের আগের এক্সপেডিশনগুলোর কথা একটু বলুন।

দীপঙ্কর -এভারেস্ট আমার ৩৭তম এক্সপেডিশন। এভারেস্ট নিয়ে ২৫টা পীক ক্লাইম্ব করেছি। এরমধ্যে কয়েকটা হল মাউন্ট কেদারনাথ, মাউন্ট কেদারডোম, মাউন্ট শ্রীকণ্ঠ, মাউন্ট ভাগীরথী টু, মাউন্ট গঙ্গোত্রী ওয়ান, মাউন্ট গঙ্গোত্রী থ্রি, মাউন্ট পোলোগঙ্গা। এছাড়াও বহু ভার্জিন পীক ক্লাইম্ব করেছি।

রাজীব -এভারেস্টের আগে ১৭টার মতো এক্সপেডিশনে গেছি। দেওটিব্বা, কেদারডোম, দীপঙ্করদা যেমন বলল বেশকিছু ভার্জিন পীক ক্লাইম্ব করেছি।

মুহিত -এভারেস্ট আমার ১০ম অভিযান। এর আগে চুলু ওয়েস্ট, মেরা পর্বতশৃঙ্গ, সিংগু চুলি পর্বতশৃঙ্গ, লবুজে পর্বতশৃঙ্গ, চো ইয়ো পর্বতশৃঙ্গ এবং নেপাল-বাংলাদেশের মৈত্রী শিখর জয় করি। ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চো ইয়ো পর্বতশৃঙ্গ (২৬,৯০৬ ফুট/৮,২০১মিটার) জয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ ৮,০০০ মিটার পর্বতারোহীরদের সম্মানজনক এলিট ক্লাবে প্রবেশ করে।

www.amaderchhuti.com

◆ মুহিত, আপনি এরপর নতুন কোন অভিযানে বেরোচ্ছেন? কবে?

মুহিত-এই সেপ্টেম্বরে বিশ্বের অষ্টম উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ মানাসলু যেতে পারি।

◆ আবার যদি সুযোগ পান এভারেস্টে যাবেন?

অবশ্যই আবার যাব (তিনজনেই)।

◆ পাহাড় ছাড়া আর কোথায় বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করে জঙ্গল, সমুদ্র?

জঙ্গল, জঙ্গল (দীপঙ্কর-রাজীব দুজনে একসঙ্গে)।

দীপঙ্কর - জঙ্গলে যেতে ইচ্ছা করে। তবে অন্যকোথাও খুব একটা যাওয়া হয় না। বছরে একবার বাড়ির সকলে মিলে আমরা পুরী যাই। ওটা একেবারে বাঁধাধরা।

রাজীব -এক্সপেডিশনেই এত সময় চলে যায় যে তারপরে আর সময় বের করা যায়না। তবে যেতে তো ইচ্ছে করেই।

মুহিত -পাহাড় ছাড়া বার্ড ওয়াচিং আর ফটোগ্রাফি আমার নেশা। মাঝেমধ্যেই বনেবাদাড়ে পাখি দেখতে বেড়িয়ে পড়ি।

◆আপনাদের আগামী অভিযানের জন্য শুভেচ্ছা রইল।

অনেক ধন্যবাদ (তিনজনেই)।

‖ ~ এভারেস্ট অভিযানের ছবি ~ ‖

Rate This : - select -
Total Votes : 1
Average : 1.00

Like 25 people like this.

tell a Friend

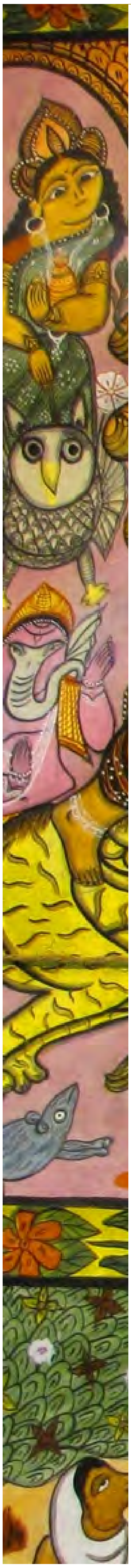

ছবিপটের ছায়ানটে

অভীক আচার্য

~ তথ্য- নয়াগ্রাম ~ || ~পটের ছবি ~

"তরুতলে কৃষ্ণ যে মূরলী দিল টান
গৃহকর্ম ছেড়ে রাধা জল আনিতে যান"

হাওড়া কলকাতা হস্তশিল্প মেলা -কাঠ, বেত, বাঁশ, বাটিক, কাঁথাস্টিচের ভিড়ে একপাশে নজরে পড়ল বেশকিছু পটচিত্র সাজিয়ে বসেছেন এক বৃদ্ধ। সামনে অসম্পূর্ণ পট, খয়ের ভেজাচ্ছেন জলে। কৌতুহলী হয়ে জানতে চাই কী করবেন খয়ের ভিজিয়ে? বৃদ্ধ উত্তর দিলেন, চলে এস বালিচক, সব দেখতে পাবে।

যেন এই ডাকটার অপেক্ষাতেই ছিলাম...।

ট্রেন যখন বালিচক স্টেশনে পৌঁছোল তখন ঠিক দুপুর একটা বেজে পঞ্চাশ মিনিট। স্টেশন থেকে একটু এগিয়ে এসে পড়লাম বাস রাস্তায়। উঠেও পড়লাম বাসে। তবে ভেতরে নয় , ছাদে। ওখানেই যা একটু জায়গা ছিল। নাম না জানা গ্রামগুলো একে একে পেরোচ্ছে আর আমি এক একবার, এক একজনকে 'দাদা/কাকু বালিচক আর কতদূর?' - জিজ্ঞাসা করে যাচ্ছি। যত মত তত পথ। প্রশ্নের থেকে উত্তর বেশি পেয়ে যখন বেশ বিভ্রান্ত হয়ে উঠেছি ঠিক তখনই রাস্তার ধারে দোকানের হোর্ডিং-এ 'বালিচক' লেখাটা নজরে পড়ল। কন্ডাক্টরও বালিচক-বালিচক বলে চিৎকার করছে। নামতে গিয়ে দেখি একটা ছাগল ঘাড়ে করে এক যুবক সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে। অগত্যা ছোট একটা লাফ দিয়ে নেমে পড়লাম। তখন মাথার উপর গনগনে সূর্য আর পেটের মধ্যে দাউদাউ আগুন। বাসস্ট্যান্ডে মাত্র দু'একটা দোকানই চোখে পড়ল। তারই একটায় ঢুকে দেখি বাংলা মদ আর মুড়ি বিক্রি হচ্ছে, সঙ্গে রসগোল্লা। চারটে বড় বড় বোম্বাই রসগোল্লা আত্মসাৎ করতে দু'মিনিটও লাগল না। খাওয়ার সময় স্বাদ বুঝিনি, পরে বুঝলাম শুধু এই রসগোল্লা খাওয়ার জন্যই বালিচক আসা যেতে পারে।

www.amaderchhuti.com

পথচলতি মানুষজনকে পটুয়াদের গ্রাম কোথায় জিজ্ঞেস করতে সকলেই একই জবাব দিলেন-'পিছন দিকে একটু যান, গেলেই দেখতে পাবেন'। একটু একটু করে তা প্রায় দেড় কিলোমিটার পার হওয়ার পর রাস্তার ধারে দেখি একটা শিরিষ গাছের গায়ে ব্যানার টাঙানো -"ময়না পটুয়া - আহার ও থাকার সুব্যবস্থা আছে"। হোটেল ভেবে ভিতরে ঢুকে জানতে পারি ময়না পটুয়া আদতে একজন পটশিল্পী। পেটের দায়ে তুলি ছেড়ে হাতা-খুন্তি ধরেছেন। মনটা খারাপ হয়ে গেল। বাইরে বেরিয়ে এসে সিগারেটের প্যাকেটটা পকেট থেকে বার করতে গিয়ে চোখ পড়ল এক বৃদ্ধের ওপরে। উনিও আমাকে আপাদমস্তক লক্ষ করছেন। এগিয়ে এসে জানতে চাইলেন আসার কারণ। সব শুনে ওনার সঙ্গে যেতে বললেন একটা সিগারেটের বিনিময়ে। সরু মেঠো পথ বেয়ে গ্রামের ভেতরে ঢুকি। উঠোন, পেয়ারাতলা, বাবলা গাছের কোল ঘেঁষে পৌঁছোই টাটি দিয়ে তৈরি আচ্ছাদনে ঘেরা, মাথার ওপর প্লাস্টিকে ছাওয়া ঘরটার সামনে। বৃদ্ধ বললেন-'ঘনশ্যাম-যান দেখে আসেন'। কাউকে দেখতে না পেয়ে ঘনশ্যাম পটুয়ার নাম ধরে ডাক দিই। ডাক শুনে একটা বাচ্চা মেয়ে বেরিয়ে এসে বলল, 'দাদু ছাগল নাড়তে গেছে, বসেন - অখনি আসবে'। মিনিট পনেরো পর একটা ছেঁড়া গামছা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বৃদ্ধ ঘনশ্যাম পটুয়া এলেন। মাঝারি উচ্চতার কাঁচাপাকা চুলদাড়িওলা এই মানুষটিকে দেখলে হঠাৎ করে হয়তো আলাদা করা যাবে না। গ্রামবাংলার দারিদ্রের চিহ্ন তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্যে, বিষণ্ণ চেহারায় আঁকা হয়ে রয়েছে। ওরই মধ্যে শিল্পীর চোখদুটো কিন্তু অন্যকথা বলছে। স্বীকৃতি কিম্বা ক্ষুধার অন্ন না পাওয়ার বেদনার পাশাপাশি জেগে রয়েছে শিল্পীর পূর্ণতার ইশারা।

Photo: Abhik Acharya

'দাদু এলোরে, আম্মা চা দে -আর একটা লোক বাইরে থেকে এসেছে দাদুর লগে দেখা করবে'-বাচ্চা মেয়েটির গলা শোনা গেল। চায়ের আমন্ত্রণে ভেতরে গেলাম। একটাই বড় ঘর - প্লাস্টিক, ছেঁড়া শাড়ি দিয়ে বিভাজন। ঘরের যে অংশটা চোখে পড়ছে তাতে একটা মাদুর পাতা আর পাশে দুটো বিরাট টিনের বাক্স। পরিচয়পর্ব শেষ হতে না হতে লাল চা নিয়ে নয়না হাজির - ঘনশ্যাম পটুয়ার নাতনি। আমার আসার কারণ শুনে টিনের বাক্স খুলে দেড়শো বছরের প্রাচীন পট মেলে ধরলেন ঘনশ্যাম। কথায় কথায় ফুটে উঠল অপমান আর বঞ্চনার সুর। এত বছর ধরে সরকার থেকে কোনও সাহায্য পাননি। চার ছেলের একজনও বেছে নেয়নি শিল্পের এই পেশা। খিদের তাগিদে তাদের কেউ দিয়েছে সাইকেলের দোকান, কেউবা হয়েছে মিস্ত্রি। তবু তিরিশ হাজার টাকার প্রস্তাব পেয়েও ঘনশ্যাম দালালের হাতে বেচে দেননি তাঁর দাদুর আঁকা 'রাবণ বধ'-এর

জড়ানো পটটির মতো অসাধারণ সব সংগ্রহ। কিন্তু এরপর?

ঘনশ্যাম একের পর এক পট দেখান আর গল্প বলেন - পটের গল্প, পটুয়াদের কথা। পটের জন্মকথার জড়িয়ে আছে এক চেনা রূপকথা। সেই এক গ্রামে বক রাক্ষস এসে উপস্থিত হয়েছিল। তার খিদে মেটাতে প্রতিদিন গ্রামের একজনকে প্রাণ দিতে হত। সেবার পালা ছিল এক ব্রাহ্মণ পরিবারের। বাবা-মা দু'জনেই আগে রাক্ষসের হাতে প্রাণ দিয়েছে। এবার ভাই বা বোনের পালা। অথচ কেউই কাউকে ছাড়তে পারছে না মৃত্যুর হাতে। সেইসময় সেই গ্রামে উপস্থিত হয়েছিল চালচুলোহীন এক ফকির। তিনি এগিয়ে আসেন ভাইবোনদের বাঁচাতে। তবে শুধু বাঁচানোই নয়, ফন্দি করে বক রাক্ষসকে আয়না পাহাড়ের সামনে নিয়ে গিয়ে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়ে তাকে ফাঁদে ফেলে হত্যাও করে সেই ফকির। এই সংবাদ রাজার কানে পৌঁছোলে রাজা পুরস্কৃত করেন ফকিরকে। চিত্ররূপে সেই বীরত্বের কাহিনি লিপিবদ্ধ করতে অনুরোধও করেন তাঁকে। ফকির সমস্ত ঘটনাটি নিয়ে গান রচনা করেন। তুলির রেখায় পটচিত্রে ফুটিয়ে তোলেন সেই যুদ্ধগাথা। অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভ শক্তির জয় দিয়ে সূচনা হল পটশিল্পের। আগে গান, পরে হয় পট।

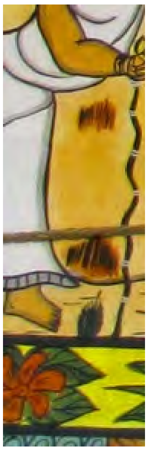

তুলি কালি মন
আঁকে লিখে তিনজন"

মুগ্ধ হয়ে শুনতে থাকি ঘনশ্যামের বিচিত্র কথা। পটশিল্পের কাহিনি চিত্রিত হত হ্যান্ডমেড পেপারের ওপর প্রাকৃতিক রং আর ছাগলের লোম দিয়ে তৈরি তুলি দিয়ে। রং বলতে গুলঞ্চ, তেলাকুচা, খয়ের, হলুদ এইসব। আর রঙের স্থায়িত্ব বাড়ানোর জন্য তাতে মেশানো হত বেলের আঠা। চিত্র সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে গেলে কাগজের পিছনে সুতির কাপড়, গদের আঠা দিয়ে আটকে দেওয়া হত। মূলতঃ দু'ধরনের পট তৈরি হয়- জড়ানো পট আর চৌকো পট। জড়ানো পটে কোনও কাব্য, ঘটনা এইসব চিত্রিত। পটুয়া দেখালেন কৃষ্ণলীলা, মনসামঙ্গল কাব্য, রামের বিবাহ, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের মতো অপূর্ব সব পটচিত্র। এখন নানান সামাজিক প্রেক্ষাপটের ওপরেও জড়ানো পট তৈরি হয়। গুনগুন করে সুর ধরলেন ঘনশ্যাম - জড়ানো পটের গল্প 'বৃক্ষরোপণ' -

'সবাই মিলে কর গাছ রোপণ
ও জনগণ
গাছ থাকিলে পরে মানুষের উপকার করে
বাতাসে নিশ্বাস ধরে গাছের ধরম'...।

'মাছের বিয়ে' কিম্বা 'সাঁওতালের চক্ষুদান' এমন সব গল্পকথা নিয়ে শিল্পী ফুটিয়ে তোলেন চৌকো পট।

শিল্পের কোনও জাত নেই, জাত নেই শিল্পীরও। ঘনশ্যাম পটুয়া আর ওসমান একই ব্যক্তি। হিন্দু-মুসলমান দুই ধর্মের মেলবন্ধনের উত্তরাধিকার এঁদের রক্তে। হিন্দুধর্ম অনুসারে অন্নপ্রাশন আর ভাইফোঁটার পাশাপাশি ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী নিকাহ্ কিম্বা মৃত্যুর পরে গোর দেওয়া হয়। এই ধর্মান্ধ পৃথিবীতে কত সহজে দুটো ধর্ম মিশে যেতে পারে দেখে আশ্চর্য হতে হয়। ডুয়েল রিলিজিওন বা ডুয়েল আইডেনটিটি এদের সম্পদ-যা কিনা এই ফান্ডামেন্টালিস্ট পৃথিবীর বুকে এক বিরল ইউনিভার্সাল ব্রাদারহুডের উদাহরণ। অথচ আমরা পারিনা।

Photo: Abhik Acharya

গল্প শুনতে শুনতে হারিয়ে গিয়েছিলাম অন্য দুনিয়ায়। হঠাৎ ঘর থেকে মাঝবয়েসি এক মহিলা বেরিয়ে এলেন-'চলেন খেয়ে লেবেন গা' - চমকে উঠলাম। এ কেমন আব্দার। চেনা নেই, জানা নেই, একেবারে ভাত বেড়ে আন্তরিকতার হুকুম জারি! অগ্রাহ্য করতে পারলাম না। শানকির থালায় মোটা চালের ভাত, ঢেড়স ভাজা আর পুঁই চিংড়ি। মন ভরে খেলাম। এতটা সম্মান, আন্তরিকতা - কোনওদিন পেয়েছি কিনা জানি না, মনে নেই। 'আর একটু ভাত দিই' - আমি অসম্মতি জানালাম - এক ঝলকে দেখার চেষ্টা করলাম সবটুকু ভাত-তরকারিই অনাহূত অতিথির পাতে ঢেলে দিয়েছে কিনা। বুঝলাম, আবার আরও একটা দুপুর বাড়ির মেয়েরা মুড়ি-বাতাসা খেয়ে কাটাবে। লজ্জা পাইনি - শুধুই বিস্ময়, শ্রদ্ধা আর অজানা একটা রাগ নিয়ে গুম মেরে গেলাম। ঘনশ্যাম পটুয়ার গলায় তখন ক্ষোভের সুর - একটা মাঝারি মাপের পট বানাতেই অনেক সময় লাগে, কিন্তু সময় কোথায়? সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কেটে যায় জমিতে জন খেটে। তারপর সূর্য ডোবা পর্যন্ত শিল্পীর নিজস্ব সময়। গোধূলির তুলির টান দিতে দিতে সে হয়তো ভাববে রামধনুতে নিশ্চয় ফুটে উঠবে আদি, অকৃত্রিম, প্রাকৃতিক, কাল্পনিক "মাছের বিয়ে"-র রূপ।

www.amaderchhuti.com

"সোনার হাতে সোনার কাঁকন কে কার অলঙ্কার কে জানে তার রূপ দিলো সে কোন মণিকার"

Photo: Abhik Acharya

ট্রেনের জানালায় সরে সরে যাচ্ছে দৃশ্যপট। কানে বাজছে ঘনশ্যাম পটুয়ার কণ্ঠস্বর। "দেখেন না শহরে গিয়ে যদি কয়েকটা ছবি বিক্রি করতে পারি। তাহলে প্রথম নাতিটার মতো দ্বিতীয় নাতনিটা নিউমোনিয়ায় মরবে না। সামনে বর্ষা-সব ভিজে যায় - শুধু পট ভর্তি টিনের বাক্সটা সবকিছু দিয়ে ঢেকে রাখি। পটগুলো যেন নষ্ট না হয়। এটা তো আমাদের দেশের গর্ব-ঐতিহ্য"।

হয়তো কিছুই করতে পারব না, ওর জন্য, ওদের জন্য - অনেকটা রাগ আর অক্ষমতা আমাকে কুরেকুরে খায়। কলকাতার জনস্রোতে হাঁটতে হাঁটতে ওই দালাল কিম্বা শৌখিন ট্যুরিস্টদের থেকে নিজেকে আর আলাদা করে চিনতে পারি না।

~ তথ্য- নয়াগ্রাম ~ ‖ ~ পটের ছবি ~

বেসক্যাম্প পর্যটন সংস্থার কর্ণধার অভীকের নেশা ও পেশা দুই-ই ভ্রমণ।

পায়ে পায়ে পাহাড়ে

বিশ্বনাথ মিত্র

~ তথ্য- সান্দাকফু ~ || ~ সান্দাকফুর ছবি ~ || ~ সান্দাকফু ট্রেক রুট ম্যাপ ~

লেডিস ট্রেক? ফুঃ!! যারা কোনদিন ট্রেক করেনি যাক না একবার গুরুদুম-এর রাস্তায় স্যাক ঘাড়ে করে।
NJP থেকে বাইশে মে'র সকালে ঝকঝকে একটা ইন্ডিকা ভিস্তা মিরিক হয়ে আমাদের নিয়ে চলল মানেভঞ্জন। একটু দাঁড়ানো গেল মিরিক লেকে। দেখলাম - ছবি তুললাম - পাইন ঘেরা ছোট্ট এক অপরূপ নৈসর্গের। বেলা হয়ে আসছে, তাড়াহুড়োয় মোমো কিন্তু খাওয়া হোলো না আমাদের কারোরই - সৌমেনদা, রত্নদীপ, অভিজিৎ, মৃত্যুঞ্জয় বা আমার।
প্রকৃতি অবশ্য সে শখ একটু হলেও মিটিয়ে দিল রাস্তায়। ঘন মেঘের ব্যারিকেড রাস্তায় দাঁড় করিয়ে দিল আমাদের। মেঘ সরতেই দেখি মিষ্টি একটা রেস্টুরেন্ট আমাদের অপেক্ষায়। বোনাস -মিষ্টি হাতে সুস্বাদু মোমো।
অবশেষে চা বাগান আর ওক-পাইন দিয়ে সাজানো দার্জিলিং পাহাড় পেরিয়ে পৌঁছলাম মানেভঞ্জন। মেঘলা বিকেলে বেশ ঠান্ডায় মনের মধ্যে উড়ু-উড়ু টেনশন নিয়ে 'মানে'র একটা কেঠো হোটেলে গুছিয়ে বসা। ক্যাপ্টেন সৌমেনদার হালকা-পলকা বিধিনিষেধের মধ্যেই একটু একটু নিয়মভাঙা। সন্ধেবেলা সুমনের সাথে আলাপ - সুমন সুব্বা - আমাদের আগামী কয়েক দিনের পথপ্রদর্শক।
অন্যরা কি ভাবছিল জানি না। একটু টেনশন আমার ছিলই ঐ বদভ্যাসটার জন্য - কলেজ জীবনের বন্ধুত্বের স্মৃতি। ছাড়তে পারিনি বা আসলে ছাড়তে চাইও নি। বাকিদের ডোবাবো না তো? খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট রাত দশটার মধ্যে। চারদিক ভয়ঙ্কর মেঘের ঘোমটায় ঢেকে নিয়ে মানেভঞ্জন বেশ রহস্যময়ী। কে তার মানভঞ্জন করবে? আমাদের ঘর এয়ারটাইট। তাই বাইরের মেঘের মধ্যে দাঁড়িয়ে রাতের ধোঁয়াশা বাড়িয়ে এলাম একটু। এর অ্যাকশন খুব শিগ্‌গির। সারারাত কাশি। পরদিন সকাল সাতটায় বেরোনো।
উঠে তো পড়লাম। হাল্কা খাওয়া। প্রথম পর্বে দু'কিলোমিটার দূরের 'চিত্রে'। পিঠে বোঝা নিয়ে এগিয়ে চলল আমাদের পঞ্চপান্ডব -এক এক জন আলাদা আলাদা ভাবে নিজের মতো করে। চিত্রে যাওয়ার রাস্তাটা বেশ চড়াই - তবে গাড়ি চলার মত চওড়া। মাঝে মাঝেই গর্বিত মাথা উঁচু গাছের সারি। আর একটু জায়গা পেলেই সবুজ ঘাস যেন বসতে বলছে। টানা দু কিলোমিটার ফুসফুসের হাপর টানার শব্দ শুনতে শুনতে এগিয়ে চললাম।
অবশেষে 'চিত্রে'। ছোট্ট একটা বাড়ী-কাম-রেস্টুরেন্টে ইনস্ট্যান্ট স্যাপ। পনেরো-কুড়ি মিনিট পরে নিজেদের পলিথিনে মুড়ে নিয়ে অল্প বৃষ্টি আর মেঘের মধ্যে দিয়ে আবার চলা শুরু। গন্তব্য নয় কিলোমিটার দুরের টুমলিং। বৃষ্টিধোয়া পাহাড় যে এত সুন্দর হতে পারে - এত অপরূপ হতে পারে মেঘাচ্ছন্ন পাইন ওকের বন বা রাস্তার অলঙ্কার রডোডেনড্রন, তা কোনদিন ভাবিনি। পথের সাথী লোমওয়ালা দুটো বিশালাকৃতির কুকুর। মৃত্যুঞ্জয়ের অল্প বয়স, তারপরে আবার নিয়মিত জগিং-টগিং করে। ও-তো লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছে সুমনের সাথে। ক্যাপ্টেনের সাথে আমি পিছনে - ছবি তুলতে তুলতে আর মাঝেমাঝে দেখা হওয়া S.S.B.-এর জওয়ানদের সাথে কথা বলতে বলতে। ইউরিক অ্যাসিডিক অভিজিৎ-ও যেন হঠাৎ কোত্থেকে বেশ এনার্জি পেয়ে গেছে।

www.amaderchhuti.com

যখন সবে মনে হতে শুরু করেছে - আর কত দূর? তখনই দূর থেকে চেনা একটা হাসি -এক মুখ দাড়ি দেখে বুঝলাম রত্নদীপ -সাথে মৃত্যুঞ্জয়। বুঝলাম পৌঁছে গিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে রিচার্জড হয়ে গেলাম। ঘুরে ফেললাম ছোট্ট পাহাড়ি গ্রামটা। ছোট ছোট তিন চারটে হোটেল আর ট্রেকার্স হাটে প্রকৃতির একদম নিজস্ব টুমলিং। রাস্তাটা বড্ড অদ্ভুত। একবার তা নেপালের একবার ভারতের। এখানে একটা ছেলের সাথে আলাপ হোলো। মনোজ -পুরো ফ্যামিলি নিয়ে এসেছে কলকাতা থেকে। ভালো লাগল হাঁটুর মারাত্মক অস্ত্রোপাচারের পরেও ওর পাহাড়ে চড়ার আগ্রহ আর পাহাড়ের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা দেখে। ওরাও সান্দাকফু যাচ্ছে।
পরদিন সকালে আমরা বেড়িয়ে পড়লাম সাত কিলোমিটার দূরের গৈরিবাস হয়ে কালপোখরি যাবো বলে। ঝলমলে দিন। গৈরিবাস পর্যন্ত রাস্তা-ও চমৎকার। তবে শেষ এক কিলোমিটার বেশ একটু যেন কষ্ট হয় - বিশেষ করে নামার সময়। আসলে ঘোড়ার ক্ষুরে রাস্তার বোল্ডার না পড়া অংশগুলো বেশ ক্ষতিগ্রস্ত।

গৈরিবাসে সকালের জলখাবার হোলো। সুমন গিয়ে আমাদের আর ক্যামেরার পাস্‌ নিয়ে এল। পেটভর্তি। মনোজরা আগে চলে গেল। আমরাও চললাম কালপোখরি -আরো চার কিলোমিটার। রাস্তার একপাশে সিঙ্গালিলা ন্যাশনাল পার্কের সবুজ গাছগাছালি দেখতে দেখতে এগোচ্ছি। রাস্তাটা বেশ এবড়ো-খেবড়ো। মাঝে মাঝেই পকেট থেকে লজেন্স-কাজু-কিসমিস খাচ্ছি। আর হাঁটছি খুব চুপচাপ কারণ শুনেছি এই রাস্তায় মাঝে মাঝেই রেড পান্ডা দেখা যায়। যদিও পাইনি দেখা। দূর থেকে কিছু বাড়ীঘর দেখে ভাবলাম পৌঁছে গিয়েছি। কিন্তু কাছে গিয়ে বুঝলাম সেগুলো S.S.B. ক্যাম্প। ওখানে মোবাইল কানেকশন পাওয়া গেল। বাড়ির সঙ্গে হালকা কথা একটু। আবার চলা। এবার সামনে একটা ছোট পুকুর। জলটা একদম কালো। এটাই তাহলে 'কালপোখরি'। পোখরি মানে পুকুর। আরও একটু এগিয়ে পৌঁছলাম আমাদের হোটেল সিঙ্গালিলায়। ড্রাগন আঁকা বড় বড় কাপে যিনি আমাদের চা পরিবেশন করলেন তাঁর নামটা বেশ - পসন্দ্‌। সদ্যযৌবনা পসন্দের হাতের চা -এক কথায় অপূর্ব। চা মানে তো শুধু চা নয়! চা পানের স্থান-কাল-পাত্র! স-ব। এ জীবনে ভুলব না। ওখান থেকেই মেঘ-বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে দেখে ফেললাম সান্দাকাফুর হোটেল 'শেরপা শ্যালে'র আবছা অবয়ব। আবার মন উড়ু-উড়ু-ঘুরু-ঘুরু।
রাতে কি খেলাম? আহা-দেশী-থুড়ি-নেপালি চিকেন আর ভাত - বাকিরা রুটি।
সকালে একটু একটু মন খারাপ। কালপোখরি জায়গাটাকে ভালোলাগা আর ভালোবাসা শুরু হয়ে গিয়েছিল। মেঘাচ্ছন্ন বিকেলে কালো পুকুরটার পাড়ে ছোট্ট চোর্তেনের সামনে বসে ইয়াকের ঘরে ফেরা দেখা বা কাজল-কালো মেঘের মধ্যে দিয়ে আরও কালো একা একটা পাখির সোলো ট্রেক -আমাদের চা খাওয়ার জায়গা - বেড়ায় ঘেরা ছোট্ট লনটা -যাঁর হাতে বানানো চা খেতাম তাঁকে -সবাইকে ফেলে রেখে আবার চলা শুরু হল আমাদের - মেঘলা চারদিক আর আরও মেঘলা মন সাথে নিয়ে। সকলে একসাথে রয়ে গেলাম শুধু ছেড়ে আসার ঠিক আগে তোলা গ্রুপ ফটোতে।

প্রথম গন্তব্য দু কিলোমিটার দূরের বিকেভঞ্জন। মেঘলা - ভিজে সবুজের মাঝে একটা চায়ের দোকান। বিকে'র সুন্দরী দোকানি আমাদের চা খাওয়ালেন। আর একগুচ্ছ রডোডেনড্রন চলল আমাদের সঙ্গে বোতল বন্দি হয়ে - নাম তার রকসি।
একটু বিশ্রামের পরই আবার হাঁটা শুরু। আর চার কিলোমিটার দূরেই সান্দাকফু। ঈশ্বরের অপার করুণা। সারা রাস্তায় আমরা অল্প-স্বল্প বৃষ্টি পেয়েছি। আর শেষ একঘন্টা একেবারে মুষলধারে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েছি আর বলেছি - প্রভু তোমার দয়ায় প্রকৃতির এই অসাধারণ রূপ দেখতে পেলাম। পলিথিন কভার ভেদ করে জামা-প্যান্ট-জুতো সব ভিজে একশা। পাহাড়ের রিজ গুলো দিয়ে যখন হাঁটছিলাম দুপাশে ম্যাপল আর ওক গাছের সারির স্যালুট নিতে নিতে মনে হচ্ছিল যেন এই তো সেই জীবন - এর জন্যেই তো মানুষ ছুটে বেড়ায় দেশ দেশান্তরে। মনে আর কিছুই থাকে না। শুধু প্রকৃতি - প্রকৃতি আর প্রকৃতি। তিনজন স্থানীয় ভদ্রলোককে নামতে দেখলাম ছাতা মাথায় দিয়ে। জিজ্ঞেস করায় বললেন আর মাত্র ১৫ মিনিট হাঁটলেই সান্দাকাফু। কিন্তু বিশ্বাস করুন তারপর কম করে দেড়ঘন্টা হেঁটেছি আমরা ভয়ঙ্কর পাহাড়ি বৃষ্টির মধ্যে। শেষটুকু শুধুই মনে হয়েছে আর একটু -আর একটু। আসলে বৃষ্টিভেজা অবসন্ন শরীর আর তখন সায় দিচ্ছিল না মনের সঙ্গে। পৌঁছলাম আমাদের হোটেল 'সানরাইজ'-এ। অসাধারণ একটা পাঁচ বিছানার চিলেকোঠার ঘর আমাদের দেওয়া হয়েছে। মনোজরাও আগেই চলে এসে আমাদের হোটেলেই আছে।

কি যে তৃপ্তি পেয়েছিলাম দুপুরে ঘি দিয়ে খিচুড়ি আর ওমলেট খেয়ে! সে স্বাদ এ জীবনে ভুলব না। তারপর আবার সান্দাকফুর এদিকে সেদিকে ঘোরা। ফালুটের পথে খানিক দূর হেঁটে আসা - এযাত্রায় ফালুট যাওয়া হচ্ছেনা আমাদের। পরদিন সকালে মেঘের আবরণ খসে গিয়ে একদিকে খুলে গেল কাঞ্চনজঙ্ঘা - কুম্ভকর্ণ - অপরদিকে মাকালু আর একটুখানি তিনি - মাউন্ট এভারেস্ট! কিন্তু মন ভরল না।
মন ভরল শেষ বিকেলে - সারা আকাশ রাঙিয়ে সূর্য যখন ডুবে যাচ্ছে। স্বচক্ষে দেখতে পেলাম - লোৎসে আর মাকালুর ফাঁক দিয়ে সেই তাকে - উত্তর-পশ্চিম কোণে নীরব প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে। বর্ষা এসে যাচ্ছে বলে সান্দাকফু-ও প্রায় ফাঁকা। মনোজদের দলটাও ফিরে গেছে সকালে। সন্ধে হয়ে আসছে - কমলা-লাল আকাশের ফোরগ্রাউন্ডে এভারেস্টের সিল্যুয়েটের সামনে নিস্তব্ধ আমরা ক'জন। বাকী জীবনের অক্ষয় স্মৃতি হয়ে থাকল ছবিগুলো। রাত্তিরে গুছিয়ে খাওয়া দাওয়া।

পরদিন ২৫ -৫-১১ আমাদের ফেরা। ভোর হওয়ার আগেই সবাই হাজির ভিউ পয়েন্টে, অবশ্য সান্দাকফুর ছোট্ট চত্ত্বরটার যে কোন জায়গাই ভিউ পয়েন্ট ! একটু পরেই উপরের মেঘে রঙ ধরতে শুরু করল। তারপর সোনালি হতে লাগল একে একে তুষারশৃঙ্গ-গুলো। কাঞ্চনজঙ্ঘা রেঞ্জ থেকে এভারেস্ট পর্যন্ত সবাই জেগে উঠছে মেঘের কম্বল সরিয়ে আমাদের বিদায় জানাতে। সঙ্গের ম্যাপের সাথে মিলিয়ে দেখছি - ওই তো পান্ডিম, কাব্রু, কোকতাং, কুম্ভকর্ণ, থ্রি সিস্টার্স, মাকালু, চামলাং! ঘোর ভাঙ্গল ক্যাপ্টেনের ডাকে। গোছগাছ করে তৈরি হতে হবে।

নামব ১৬ কিলোমিটার নীচে - 'গুরদুম' আর তারপর ৪ কিলোমিটার দূরের শ্রীখোলায়। পুরো ট্রেকটায় এই পথটা আমার সবচেয়ে কষ্ট হয়েছে। প্রথম জানলাম পাহাড়ে চড়াই-এর চাইতে উতরাই-তে কষ্ট বেশি। অথচ প্রথম ৬-৭ কিলোমিটার বুঝতেই পারিনি কতটা কঠিন পথ আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে। অসাধারণ সব ফুলের গাছের মধ্যে দিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ বুঝলাম এই বারের জার্নি সত্যিকারের টাফ্। শেষ দশ কিলোমিটার রাস্তা একদম খাড়া নিচে নেমে গেছে।
গুরদুমে পেট ভরে খেলাম। ফুরিয়ে আসা জলের স্টক নতুন করে নিয়ে আবার হাঁটা শুরু করলাম। শ্রীখোলা নদীকে সাথে নিয়ে কখনও নীচে কখনও উপরে করতে পৌঁছে-ও গেলাম শেষ অব্দি শ্রীখোলা। শেষটায় একটু ভয় লাগছিল। পাহাড়ি জঙ্গলে ঝড় আর মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছিল শেষ বিকেলে। শ্রীখোলায় হোটেলের কাছে এসে কিন্তু আর ঢুকতে ইচ্ছে করছিল না - দুচোখ ভরে দেখছিলাম বর্ষাস্নাত পাহাড়ি নদীর চঞ্চল রূপ। শেষটায় বকা খেয়ে সম্বিত ফিরল। দৌড়ে ঢুকে গেলাম প্রায় নদীর উপরেই আমাদের ঘরে। আরিব্বাস্ - কি ঘর একখানা! নদীর দিকে লম্বা জানলা - শুধুই কাচের। পুরো 'একঘর'!

www.amaderchhuti.com

Photo: Biswanath Mitra

পরদিন সকালে বাটার টোস্ট খেয়ে শ্রীখোলা ব্রীজ পেরিয়ে চললাম রিম্বিকের পথে। সুন্দর রৌদ্রোজ্জ্বল রাস্তা। পায়ের ব্যথাটা বেশ ভোগাচ্ছিল। তাই শেষটুকু কোনরকমে পাড়ি দিলাম। কতদিন পরে রসগোল্লা টাইপের মিষ্টি খেতে পেলাম রিম্বিক বাজারে। তারপর ফুলে ঘেরা হোটেল গ্রীন হিল -পাইন কাঠের ঘর -সামনে ছোট্ট এক চিলতে লন - রাতে ওপারের পাহাড়ে আলো ঝলমলে দার্জিলিং। দুর্দান্ত ঘরোয়া খাওয়া আর দাওয়া।
তারপর রাত পোয়ালে ঘুম-এর পথে সেই NJP জিপে করে। সে অবশ্য অন্য গল্প।

~ তথ্য- সান্দাকফু ~ ‖ ~ সান্দাকফুর ছবি ~ ‖ ~ সান্দাকফু ট্রেক রুট ম্যাপ ~

ভারত সরকারের মহাগাণনিক দপ্তরে কর্মরত বিশ্বনাথের নেশা ভিডিও এডিটিং ও ক্যারম খেলা।

অমরনাথের ডায়েরি

অপূর্ব ঘোষ

~ তথ্য- অমরনাথ ‖ অমরনাথের ছবি ‖ অমরনাথ ট্রেক রুট ম্যাপ ~

ইচ্ছা অনেকদিনেরই। নানা কারণে আগে হয়ে ওঠেনি। এবার তাই মনে মনে ঠিকই করে ফেলেছিলাম অমরনাথ দর্শনে আমি যাবই। ক্যামেরার সাথে সঙ্গী ছিল খাতাকলমও। মনের পাতায় ফুটে ওঠা দৃশ্যগুলো হারিয়ে যেতে দেবনা, অনেকদিন পরেও ডায়েরির পাতা উলটে অনুভব করব অনন্য অভিজ্ঞতার সেই স্পর্শ।

২৬ জুন -২৮ জুনঃ- ২৬ তারিখ দুপুর ঠিক ১টা ৪৫মিনিটে বর্ধ্মান স্টেশন থেকে জম্মু- তাওয়াই এক্সপ্রেসে চেপে বসলাম অমরনাথ যাওয়ার উদ্দেশ্যে। ক্রমে বাংলা ছাড়িয়ে ট্রেন বিহারে প্রবেশ করল। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। বিহারের কোডারমা থেকে গয়া পর্যন্ত দুধারে ছোট ছোট পাহাড়, জঙ্গল আর একের পর এক টানেল। আলো-আঁধারিতে ভীষণ ভালো লাগছিল। রাতে শুয়ে অনেকক্ষণ ঘুম আসছিল না। তারপর কখন যে ট্রেনের দোলায় চোখটা লেগে গেছে কে জানে! হঠাৎ চটক ভেঙে গেল বেনারসে গঙ্গা পেরোনোর শব্দে। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আবছা আলোয় গঙ্গার ঘাটগুলো দেখতে পেলাম। মনে মনে 'জয় বাবা বিশ্বনাথ' বলে ডান হাত কপালে ঠেকালাম। এরপর লখনউ, শাহাজাহানপুর, মুরাদাবাদ পেরিয়ে জম্মু পৌঁছালাম ২৮ তারিখ সকালে।

স্টেশনে নেমে দেখি চরম অসহযোগিতা ও অব্যবস্থার ছবি। স্টেশনের বাইরে জম্মু-কাশ্মীর ট্যুরিজমের রিসেপশন সেন্টার থেকে যে তথ্য পাওয়া গেল পরে দরকারের সময় বুঝেছিলাম সবই ভুল।

২৯ জুনঃ- একদফা সিকিউরিটি চেকিংয়ের পর পহেলগাঁও-এর দিকে রওনা দিলাম। এপথে বাসভাড়া পড়ে মাথাপিছু ২০০ টাকার মতন আর শেয়ারের গাড়িতে ভাড়া ৩৫০-৪০০ টাকা। যেন নাগরদোলায় ঘুরপাক খেতে খেতে পাহাড়ের মাথায় উঠছি আর নামছি। চারদিকটা সবুজ - নিস্তব্ধ, শুধু মাঝে মাঝে হাওয়া দিলে মনে হচ্ছে যেন গাছগুলো আকাশের সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলছে। সমস্ত রাস্তাতেই মাঝেমধ্যে লঙ্গরখানা আছে। উধ্মপুর, পত্নীটপ হয়ে আড়াই কিলোমিটার দীর্ঘ জওহর টানেল পেরিয়ে অনন্তনাগের ওপর দিয়ে অবশেষে পহেলগাঁও পৌঁছোলাম।

আরেকদফা সিকিউরিটি চেকিংয়ের পর বেসক্যাম্পে ঢোকার ছাড়পত্র মিলল। জম্মু থেকে আসার সময় দেখেছি একটু দূরে আধা সামরিক বাহিনী টহল দিচ্ছে, আর এখন বেসক্যাম্পের ভেতরে ঢুকে মনে হল যেন কোনও সেনা ছাউনিতেই ঢুকে পড়েছি।

সারি সারি তাঁবু পড়েছে লিডার নদীর ধারে আর মূল রাস্তার দুপাশে। পছন্দমতো একটা টেন্ট ঠিক করে (মাথাপিছু ৭৫ টাকা) জিনিসপত্র রেখে পাশের লঙ্গরখানায় গেলাম খাবার জন্য। এ তো রাজকীয় আয়োজন। সবরকম খাবারই মিলবে নিখরচায়, তবে নিরামিষ। 'আও ভোলে আও, খানা খাও'-লঙ্গরের লোকজনের কি আন্তরিক আহ্বান - এখনও যেন কানে বাজছে।

www.amaderchhuti.com

Photo: Debasish Ray

৩০ জুনঃ- যাত্রা শুরু আগামীকাল, পয়লা জুলাই। এদিনটা কাটল পহেলগাঁও ঘুরে বেড়িয়ে আর কেনাকাটায়। সমুদ্রতল থেকে ৭৫০০ ফুট ওপরে পাহাড়ে ঘেরা ছোট্ট সুন্দর, নিরিবিলি শহর পহেলগাঁও। তবে এখন অমরনাথ যাত্রী, সাধু-সন্ন্যাসী, কুলি, ঘোড়াওলা, দোকানদার, লঙ্গরখানার লোকজন, মিলিটারি - একেবারে জমজমাট অবস্থা।

বহুযুগ আগে এই রাস্তা দিয়েই আসত মধ্য এশিয়ার যাযাবর দস্যুর দল - এসেছে মিহিরগুল আর চেঙ্গিস খান। হাঁটতে হাঁটতে এইখানে এসেই প্রথম পেত খাদ্য আর পানীয়। জোজিলা গিরিবর্ত্ম পেরিয়ে লাদাখ থেকে কাশ্মীরের পথে প্রথম জনপদ। তাই নাম প্রথম গ্রাম বা পহেলগাঁও।

১ জুলাইঃ- সকালবেলায় বেসক্যাম্পের ক্লোকরুমে অতিরিক্ত জিনিসপত্র জমা দিয়ে চন্দনবাড়ির উদ্দেশে রওনা দেবার জন্য বেরোচ্ছি, দেখি সামনের পাহাড়ের মাথায় এক বিশাল রামধনু। মনে হল যেন স্বয়ং দেবতাত্মা হিমালয় অমরনাথ যাত্রীদের বরণ করার জন্য হাতে মালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বেসক্যাম্পের সামনে থেকেই শেয়ারের গাড়িতে চেপে (মাথাপিছু ৭৫ টাকা) ১৬ কিলোমিটার দূরে ৯,৫০০ ফুট উচ্চতার চির-পাইনে ছাওয়া চন্দনবাড়ি পৌঁছোলাম। এই চন্দনবাড়ি থেকেই অমরনাথ যাত্রার হাঁটাপথ শুরু। প্রথম দিনই হাঁটতে হবে সাড়ে ১২ কিলোমিটার। তাই আর দেরি না করে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমেই পড়ল সেনা ছাউনি। আবার একদফা চেকিং-এর পর যাত্রার অনুমতি মিলল। অমরনাথের নাম স্মরণ করে যাত্রা শুরু করলাম। খানিক দূরে দূরে অতন্দ্র প্রহরীদের সঙ্গে দেখা হলেই চলছে শুভেচ্ছা বিনিময়ের পালা। একটু চলার পরেই হাঁপ ধরছে, দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছি আর মনে মনে ভাবছি, সামনেই পিসুটপ, পেরোব কী করে?

Photo: Apurba Ghosh

চন্দনবাড়ি থেকে একটু এগিয়েই হিমবাহ। হিমবাহের গা বেয়ে, লিডার নদীর পাশে পাশে পথচলা। শ্যামল সবুজ উপত্যকায় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে চির, পাইন, দেবদারুর দল। চারপাশের এই অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই এখন ক্লান্তি দূর করবার একমাত্র ওষুধ।

পিসুটপ পেরোলে এমন বড় বড় গাছ আর দেখা যাবে না। সাধারণত হিমালয়ে ১১,০০০ ফুট উচ্চতায় বড় গাছ দেখা যায় না। বর্ষা বা শরতকাল ছাড়া এই জায়গাগুলোও তুষারাবৃত থাকে। হাঁটা থামিয়ে একেকসময়ে দাঁড়িয়ে পড়ি। মনে হয় যেন আর পারছি না। তাকিয়ে দেখি ঘোড়া বা পিঠুর পিঠে করে উপরে লঙ্গরখানার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে গ্যাস সিলিন্ডার থেকে জেনারেটর পর্যন্ত। সত্যিই কী অমানুষিক পরিশ্রম - ওদের দেখে মনে জোর পাই, শুরু করি আবার চড়াই ভাঙা। কথিত, পুরাকালে দৈত্যদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে দেবতারা অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করেন। এইখানেই ওপর থেকে পাথর গড়িয়ে ফেলে অসুরদের পিষে হত্যা করেন। তাই এর নাম পেষণঘাঁটি বা পিসুটপ। অন্যমতে, কাশ্মিরী ভাষায় 'পিসর' শব্দের অর্থ পিছল, তাই থেকেই এই নামের উৎপত্তি। চূড়ান্ত কষ্টকর এই রাস্তা একেবারে ইংরেজির জেড অক্ষরকেও হার মানায়। প্রচণ্ড চড়াই আর বাঁক। চলার ছন্দ মাঝে মাঝেই নষ্ট করে দেয় ঘোড়ার দল। পথচলার ক্লান্তিতে আর প্রকৃতির শোভা বেশিক্ষণ মনে স্থায়ী হচ্ছে না। বড় বড় গাছ শেষ হয়ে এসেছে। এখন শুধু পাথর আর মাটির পাহাড়। বৃষ্টি হলে এই রাস্তা খুব ভয়ঙ্কর হয়ে যায়। চারিদিকে ঝরনা আর নদীগুলো বরফের স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুএকটা তিরতির করে ঝরছে। একজন

ভদ্রলোক তাঁর আট বছরের পঙ্গু ছেলেকে কাঁধে করে চলেছেন।
অবশেষে উঠে এলাম ১১,৫০০ ফুট উচ্চতায় পিসুটপে। ঘাসে ছাওয়া ছোট্ট উপত্যকা। মাঝখানে একটা লঙ্গরখানা আর অনেকগুলো ছোট ছোট দোকানপাট। পাঁচ টাকার জিনিস বিক্রি হচ্ছে পঁচিশ টাকায়। লঙ্গরখানার কাছে আসতেই আবার সেই একই আহ্বান-'আও ভোলে খাও ভোলে'। দুপুর তখন প্রায় দুটো। তাই সামান্য কিছু খেয়ে একটু বিশ্রাম। এত ক্লান্তি কিন্তু একটু বিশ্রামেই কেটে গেল, বোধহয় হিমালয়ের স্নিগ্ধ বাতাসে।
আবার হাঁটা শুরু। হিমালয়ের গা বেয়ে সরু রাস্তা চলেছে - বাঁদিকে হিমালয় আর ডানদিকে লিডার নদী গভীর খাদ দিয়ে প্রচণ্ড গতিতে বয়ে চলেছে। পাহাড়ের গায়ে মাঝে মাঝে ছোট ছোট ফুলের গাছ - হাওয়ায় দুলছে। মনে হয় আমাদের দেখে ঠিক যেন মাথা নেড়ে হাসছে।
অনেকেই প্রথম রাতটা জোজিবালে কাটান। কিন্তু আমার গন্তব্য শেষনাগ, আরও অনেকটা পথ বাকি। এই পথে তুলনামূলকভাবে কষ্টটা অনেক কম। একটু পরেই দেখি একটা নদী পুরোটাই জমে স্থির হয়ে আছে আর বরফ নিয়ে সবাই ছোটদের মত খেলায় মেতেছেন। এই বিশাল হিমালয়ের কোলে সকলেই যেন ছোট হয়ে যায়। সামান্য চড়াই উতরাই ভেঙে একটা বাঁক ঘুরতেই শেষনাগের দেখা পেলাম, কী অপূর্ব সুন্দর!

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর - তিন পাহাড় দিয়ে ঘেরা পান্নাসবুজ শান্ত টলটলে হ্রদের জলে পড়েছে পাহাড় আর নদীর ছায়া। সমুদ্রতল থেকে ১১,৭৫০ ফুট ওপরে রয়েছি। এখান থেকেই লিডার নদীর পথচলা শুরু। ভাবি, প্রকৃতির এ কী অদ্ভুত খামখেয়াল -চারদিক থেকে বয়ে আসা যে নদীগুলো শেষনাগকে ছুঁয়েছে তারা সবাই জমে স্থির হয়ে আছে, অথচ, শেষনাগের জলে তার কোনও প্রভাবই পড়েনি। কাশ্মীরি ভাষায় 'নাগ' শব্দের অর্থ সরোবর। অমরনাথের পথে এটাই শেষ জলাশয়। হয়তো তাই নাম হয়েছে শেষনাগ। আবার প্রচলিত গল্পকথা বলে বহু অতীতে সুশ্রবসনাগ এই সরোবর খনন করান, তাই এই নাম। শেষনাগকে ডানদিকে ফেলে মিনিটদশেক হাঁটার পর টেন্ট এলাকায় পৌঁছোলাম। পথের দুপাশে সারি সারি তাঁবু। সারাদিনের পরিশ্রমের পর কিছু খেতেও প্রায় ইচ্ছে করছে না। দেখেশুনে একটা টেন্টে (মাথাপিছু ১৬০ টাকা) রাতের মতো আশ্রয় নিলাম। এইসব টেন্ট মালিকদের ওপর প্রশাসনের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। খুবই নিচুমানের ব্যবস্থা, না আছে আলো এমনকি ভালো বিছানাও। অমরনাথের কাছে যাচ্ছি, তাই এই অসুবিধার কথা মনে ঠাঁই দিলাম না। এখানে সন্ধ্যা হয় প্রায় ৭টার সময়। আশপাশটা একটু ঘুরে দেখে লঙ্গরখানায় খেয়ে তাঁবুতে ফিরলাম। প্রচণ্ড ঠান্ডায় হাত পা অবশ হয়ে যাচ্ছে। শুয়ে শুয়ে পরেরদিনের কথা ভাবতে ভাবতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়লাম।

২ জুলাইঃ- ভোরবেলা ঘুম ভেঙে দেখি চারদিকে সাজো সাজো রব - যাবার জন্য সবাই তৈরি হচ্ছে। আমিও তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে টেন্ট থেকে বেরোলাম। লঙ্গরখানা থেকে সামান্য চা ও টিফিন খেয়ে বাবা অমরনাথের নাম স্মরণ করে পঞ্চতরণীর উদ্দেশে হাঁটা শুরু করলাম। একটু ঢালুতে নেমে পৌঁছালাম গ্লেসিয়ারের ওপর। একটা ছোট্ট ঝরনা পেরিয়ে আবার চড়াই আরম্ভ হল। বরফ আর বরফ -হাঁটু পর্যন্ত মাঝে মাঝে তুষারে ডুবে যাচ্ছে। অনেকে দেখি বরফের ওপর বসে স্কি করে উতরাইয়ে নামছেন। একটু হাঁটছি আর জিরোচ্ছি। মহাগুনাস পাস ১৪,৫০০ ফুট উচ্চতায়, এখানে অক্সিজেনের পরিমাণ এতই কম যে তাড়াতাড়ি হাঁপ ধরে যাচ্ছে। কিন্তু কী অপূর্ব চারপাশ -বরফেরই কত রূপ!
ভক্তদের বিশ্বাস, অমরনাথ দর্শন করব বলে যদি কেউ এই পথে বের হন, স্বয়ং ভোলানাথই তাঁর সব দায়িত্ব তুলে নেন। যেন এরই প্রমাণ পেলাম হাতেনাতে -এক বৃদ্ধা এক হাঁটু বরফের মধ্যে দাঁড়িয়ে হাউ হাউ কাঁদছেন আর বলছেন, 'অমরনাথ হি হামকো লে যায়গি' - পরের মুহূর্তেই দেখি কর্তব্যরত দুই জওয়ান তাঁর দুই হাত ধরে প্রায় তুলে নিয়ে যাচ্ছেন। ভাবি, স্বয়ং ভোলানাথই কি এইভাবে এঁদের বেশে এখানে আসেন?

amaderchhuti.com

মাথা নিচু করে চড়াই ভাঙতে ভাঙতে হঠাৎ সামনে তাকিয়ে দেখি, এক বিশাল বরফে মোড়া সাদা পাহাড় যেন রাস্তা আগলে দাঁড়িয়ে আছে। ঝকঝকে নীল আকাশের পটে এক অসাধারণ ছবি।
মহাগুনাস পাসে পৌঁছোতেই জওয়ান ভাইয়েরা যত্ন করে গরম জলের গ্লাস এগিয়ে ধরলেন। গরম জলটা খেয়ে যেন ধড়ে প্রাণ এল। এখানে বেশিক্ষণ থাকতে দেয় না, তাই আবার হাঁটা শুরু করলাম, এবার উতরাই। জওয়ান ভাইয়েরা সবাইকে সাবধান করে বলছেন, চোখে সানগ্লাস, মাথায় টুপি, হাতে গ্লাভস পড়ুন। প্রথমে এটা একটু বাড়াবাড়িই মনে হচ্ছিল, পথে নেমে বুঝলাম কারণটা কি, উতরাইয়ে কিছুটা নামতেই মনে হল চারপাশে সাদা বরফে মোড়া পাহাড়ের মাঝখানে আমি যেন আটকে গেছি। সূর্য একেবারে মাথার ওপর - বরফের ওপর রোদ পড়ে চোখ একেবারে ঝলসে দিচ্ছে। অথচ এই বরফের রাজ্যেই দেখি দুটো বাচ্চা মেয়ে কেমন অবলীলাক্রমে একপাল ছাগল-ভেড়া চড়াতে নিয়ে যাচ্ছে। একটা খরস্রোতা নাম না জানা নদীর ওপরে পাটাতন দেওয়া কাঠের অস্থায়ী পুল পেরিয়ে ওপারে পৌঁছে নজরে পড়ল এক যাযাবর পরিবারকে। পাথরের ওপর পাথর সাজিয়ে গড়ে তোলা তাঁদের ছোট্ট ঘরের সামনে বসে দৈনন্দিন কাজকর্ম সারছেন। সামনের একফালি খোলা জায়গাটায় তাঁদের পোষা ঘোড়া আর তার বাচ্চা চড়ছে। একটা বাঁক ঘুরে কিছুটা নীচে নেমে এসে আবার একটা কাঠের পুল পেরিয়ে বেশ অনেকটা সমতল।
পঞ্চতরণী পৌঁছেছি - সমুদ্রতল থেকে ১১,২০০ ফুট উচ্চতায় ভীমা, ভগবতী, সরস্বতী, ঢাকা, বর্গশিলা - এই পাঁচ নদীর মিলনক্ষেত্র। তীর্থের নিয়মমতো, প্রত্যেক যাত্রীকে এখানে পরপর পাঁচটি নদীতে স্নান করতে হয়। কিন্তু এই ঘোর ঠান্ডায় আমার সেই সাহস নেই। চারদিকে উঁচু উঁচু বরফে মোড়া পাহাড়। সেই অপরূপ সৌন্দর্যের মধ্যেই ক্লান্ত শরীরটাকে টেনে নিয়ে লঙ্গরখানা পেরিয়ে টেন্টগুলোর দিকে এগোই। অনেক টেন্ট, সুবিধামতো একটা ঠিক করে নিলেই হল। জনপ্রতি খরচ পড়বে মোটামুটি ২০০ টাকা। যাঁরা হেলিকপ্টারে এসেছেন তাঁদেরও এখানে নেমেই হেঁটে, ঘোড়ায় বা পালকিতে অমরনাথ দর্শনে যেতে হয়। প্রায় ২ কিলোমিটার সমতল। মাটি-ঘাস-পাথর ছড়ানো রাস্তা। বাঁদিকে নদী আর ডানদিকে যেন হাত বাড়ালেই রুক্ষ তিনটি পাহাড়। তাদের গায়ে মাঝে মাঝে বরফ জমে আছে। পথচলার ক্লান্তিতে আর কোনওদিকে তাকাতেই যেন ইচ্ছে করছে না। তার ওপর হিমেল বাতাস শরীরে দাঁত বসাচ্ছে। তাই তাড়াতাড়ি টেন্টে ঢুকে লেপ ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়লাম।
একটু বিশ্রাম করে কিছুটা চাঙ্গা হয়ে নিয়ে আরও এক প্রস্থ গরম জামাকাপড় গলিয়ে বেরোলাম। এখানে রাত আটটা পর্যন্ত দিনের মতো ভালো আলো থাকে। তাঁবুগুলো পেরিয়ে একটু এগিয়ে গেলাম কাল যে পথে যেতে হবে সেইদিকে। দেখি অমরাবতী নদীর জল জমে বরফ হয়ে রয়েছে। প্রচণ্ড ঠান্ডা হাওয়া যেন শরীরের সব রক্তকে জমিয়ে দেবে। ঠান্ডার চোটে বেশিক্ষণ বাইরে থাকা গেল না। লঙ্গরখানায় রাতের খাওয়া সেরে তাড়াতাড়ি তাঁবুতে এসে শুয়ে পড়লাম।
৩ জুলাইঃ- ভোর তিনটের সময় ঘুম ভেঙে দেখি তাঁবুর বাকী সবাই যাওয়ার জন্য তৈরি। যাঁরা ঘোড়ায় চড়ে যাবেন তাঁরা ঘোড়াওয়ালার সঙ্গে দর কষাকষি করছেন। আমিও তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিলাম। মনের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা। এতদিনের স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে। পঞ্চতরণী থেকে রওনা হয়ে প্রথমেই পড়ল ভৈরবঘাটির দুরন্ত চড়াই। একটু হাঁটার পরেই মনে হচ্ছে বুকের ভিতর থেকে ফুসফুসটা যেন বেরিয়ে আসছে। যাঁরা ফিরছেন (বেশিরভাগই ঘোড়ায়) তাঁদের জিজ্ঞাসা করছি, কেমন দেখলেন কিম্বা আর কতদূর? তাঁরাও আশ্বাস দেন, এইতো এসে গেছে, আর একটু। গরম জামাকাপড় সব খুলে ফেলেছি। গোটা গা ঘামে ভিজে গেছে। লাঠিতে ভর দিয়ে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিচ্ছি। বেশিক্ষণ বিশ্রামও নেওয়া যাবে না, তাহলেই পা জড়িয়ে যাবে। প্রায় দু'ঘন্টা এভাবে চড়াই ভাঙার পর উতরাই পেলাম। মাটি আর পাথরের রাস্তা - চারদিক ধুলোয় ধুলোময়। ভালো করে নিশ্বাস পর্যন্ত নেওয়া যাচ্ছে না।
যাঁরা দর্শন করে ফিরছেন তাঁদের মুখে অনাবিল একটা প্রশান্তি মাখা। আমার করুণ অবস্থা দেখে বলছেন, আর বেশিদূর নয়, অমরনাথের নাম করে এগিয়ে যান। লাঠিতে ভর দিয়ে খুব সাবধানে অমরনাথ উপত্যকার গ্লেসিয়ার পেরোচ্ছি। দূর থেকে গুহার মুখ দেখতে পেয়ে মনে মনে বাবা অমরনাথকে প্রণাম জানালাম। দেখে মনে হচ্ছে যেন খুব কাছে এসে গেছি, কিন্তু যতই এগোই গুহা ততই দূরে সরে যাচ্ছে। ডানদিকে অমরগঙ্গা জমে বরফ হয়ে আছে। এখানে অনেক টেন্ট আছে, তাতে রাত্রিবাসও করা যায়। পুজোর জিনিসপত্র কিনে এগোতে লাগলাম। আবার চেকিং। গ্লেসিয়ারের পর থেকে সিঁড়ি শুরু হয়েছে। নামেই সিঁড়ি - মাপের কোন ঠিকঠিকানা নেই - কোনওটা পাঁচফুট চওড়া তো দু'ফুট উঁচু। দু'তিনটে সিঁড়ি উঠি, আর বিশ্রাম করি। এখান থেকেই বারা অমরনাথের জয়ধ্বনি আর ঘন্টার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। বেশ কয়েকটা সিঁড়ি উঠে জুতো রাখার ব্যবস্থা। চারদিকে শুধু বরফ আর বরফ। জওয়ান ভাইরা বেলচা দিয়ে প্রায় চার-পাঁচ ফুট বরফ কেটে রাস্তা করছে। জুতো খোলার পর মনে হচ্ছে পা দুটো যেন অবশ হয়ে যাচ্ছে। আবার ক'টা সিঁড়ি। এখান থেকে সিকিউরিটির লোকজন গুনে গুনে লোক ছাড়ছেন যাতে ওপরে একসঙ্গে বেশি ভিড় না হয়। এরকম দুটো বাধা পেরিয়ে ১৩,৫০০ ফুট উচ্চতায় গুহামুখে পৌঁছে পেলাম তুষারলিঙ্গ অমরনাথ দর্শন। কী অপূর্ব! সব

কষ্ট যেন নিমেষেই ভুলে গেলাম- মন ভরে গেল আনন্দে- চোখ থেকে আপনা-আপনিই জল বেরিয়ে আসছে। এত আনন্দ যেন সারা জীবনেও ফুরোবে না।
এখন আর কাউকে তুষারলিঙ্গের কাছে যেতে দেওয়া হয় না। সামনে লোহার রেলিং দেওয়া। দুচোখ ভরে দেখছি আর মনে মনে বলছি বহুজন্মের পুণ্যের ফলে এ দর্শন। এক জওয়ান ভাইয়ের স্পর্শে জ্ঞান ফিরল - এগোতে হবে। পুজোর জিনিসপত্র পুরোহিতের হাতে দিলাম। তিনি বেদিতে ঠেকিয়ে তা ফেরত দিলেন। বেশিক্ষণ তুষারলিঙ্গের সামনে থাকতে দিচ্ছে না। অগত্যা মূল বেদি থেকে একটু নিচে নেমে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে দেখি দুটো সাদা পায়রা উড়ে এসে গুহার গায়ে পাথরের ওপর বসল। শোনা যায়, সেই পুরাণের সময় থেকেই একজোড়া কপোত-কপোতী অমরনাথে বাসা বাঁধে, এরা নাকি অমর! সত্যি-মিথ্যে জানিনা, শুধু মনে হল বাবা অমরনাথের দয়ায় এই যাত্রাতেই সেই পুণ্যদর্শনও হয়ে গেল।

পুরাণে আছে, নারদমুনির প্ররোচনায় পার্বতী শিবের কাছে ত্রিভুবনের সৃষ্টিরহস্য জানতে চান। পার্বতীকে নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে শেষে রাজি হন শিব। অথচ সৃষ্টিরহস্য বলতে হবে অতি সঙ্গোপনে যাতে কেউ না শুনতে পায়। অনেক খুঁজে শেষে তিনি হিমালয়ের বুকে এই গুহা আবিস্কার করেন। দেবাদিদেব শুরু করলেন অমরকথা বা সৃষ্টিরহস্য। কত দিন, কত যুগ পার হল তার কোনও হিসেব নেই। একদিন শেষ হল অমরকথা। শিব চোখ খুলে দেখেন পার্বতী ঘুমিয়ে পড়েছেন কবেই, আর এতদিন ধরে সৃষ্টিরহস্য কথা শুনেছে এক শুকপাখি। পার্বতীর বদলে সেই এতদিন সাড়া দিয়ে এসেছে। দেবাদিদেবের ক্রোধের ভয়ে শুক উড়তে উড়তে গিয়ে ব্যাসদেবের পত্নীর উদরে প্রবেশ করে। ব্যাসদেবের পত্নীর কাছে হার মেনে শিব আশীর্বাদ করেন তাঁর পুত্ররূপে ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে জন্ম নেবে এই শুক। আর যে গুহায় বসে সে অমরকথা শুনেছে তা অমরতীর্থে পরিণত হবে। মহাদেব সেখানে স্বয়ং অধিষ্ঠান করবেন অমরনাথ রূপে। মতান্তরে, এই লীলাশুকই কপোত-কপোতীর রূপ ধরে অমর হয়ে রয়েছেন অমরনাথে।
এইসব কথা-কাহিনির কোনও শেষ নেই। যত শুনি, ততই আরও শুনতে ইচ্ছে করে। এবার ফেরার পালা - মন চায়না, তবু ফিরতে হবে। একটু করে নামি আর ঘুরে দাঁড়াই, দেখি। প্রণাম করে মনে মনে বলি, তুমি চাইলে আবার আসব তোমাকে দর্শন করতে।

~ তথ্য- অমরনাথ ‖ অমরনাথের ছবি ‖ অমরনাথ ট্রেক রুট ম্যাপ ~

www.amaderchhuti.com

চিত্র সাংবাদিক অপূর্ব যুক্ত রয়েছেন একটি বাংলা সংবাদপত্রের সঙ্গে।

Rate This : - select -
Total Votes : 1
Average : 1.00

Like 2 people like this.

tell a Friend

Post Comments

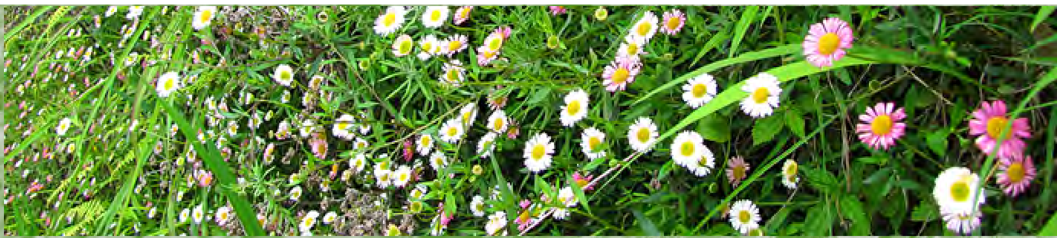

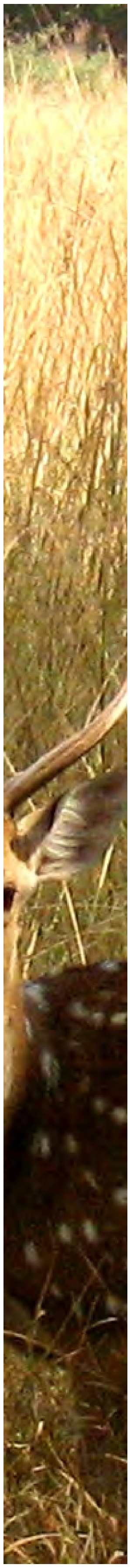

কবিতায় চড়ে
বান্ধবগড়ে

অভিষেক চট্টোপাধ্যায়

~ তথ্য- বান্ধবগড় ~ ‖ ~ বান্ধবগড়ের ছবি ~

তখন সবে ভোর হয়েছে বিছানার পাশে জানলায়
আলগা চালে নরম আলো পড়ছে সবুজ পাল্লায়।
ঘুমঘুম চোখ শীত-শিহরণ শরীরে আলতো চাদর
আড়মোড়া ভাঙা সকালের ঠোঁটে চায়ের উষ্ণ আদর।
ঘড়িতে তখন ছ'টা বাজে সবে ডাক শুনি দয়া ভাইয়ার
'চলিয়ে দাদা, রেডি হ্যায় সব, গাড়ি ভি হ্যায় তৈয়ার'
কালকে রাতেই এসেছি এখানে বান্ধবগড় জঙ্গলে
একে একে সব জিপসি ছাড়ে হইচইরই দঙ্গলে।
আট থেকে আশি গাড়ি ভরা হাসি আনন্দে মাতোয়ারা
সারাবছরই জঙ্গল খোলা, বর্ষার দিন ছাড়া।
রিসর্ট থেকে বেরিয়ে যে পথ সে পথে পাগলা ঝোরা
ছপাৎ জলে ভিজল চাকা উড়ল পাগলপারা।
খানিক যেতেই অরণ্যপথ সবুজ সিংহদ্বার
ওটা পেরোলেই সবুজের ডাক, সাধ্যি কী এড়াবার?
তবে তার আগে টাকা জমা দিয়ে পারমিট নিতে হয়
www.amaderchhuti.com
যদিও এখন ইন্টারনেটে কিছু অলভ্য নয়।
শুধু তাই নয়, পথে ভাগ আছে, 'এ' 'বি' 'সি' 'ডি' কতশত
ছুটবে না গাড়ি জঙ্গলপথে নিজের ইচ্ছেমতো।
দয়া ফিরে এলো হাতে নিয়ে তার গাড়িটির অনুমতি
আমাদের গাড়ি ছুটবে 'বি' পথে, বেঁধে দেওয়া তার গতি।
এমন সময় কোথা থেকে এল বীরপুঙ্গব দল
মাথাখোলা জিপে লম্ফঝম্প যাত্রীরা চঞ্চল।
বিদেশিনী যেই আপ্লুত মুখে ক্যামেরা করেছে তাক
ল্যাজ উঁচিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে গেল খ্যাঁকখ্যাঁক।
'বাবা রে মাগো রে', থুড়ি থুড়ি থুড়ি 'হোয়্যার ইজ মম -ড্যাড?'
পালিয়ে বাঁচবে সে পথও নেই যে কী কাণ্ড রে বাবা, ধ্যাৎ!
কপাল ভালো, ঠিক সে সময় দরজাটি খুলে দিল
যত গাড়ি সব দে ছুট ছুট এযাত্রা বাঁচা গেল।
বুকের ভেতর চড়ছে পারদ থমথমে রোমাঞ্চ
ছুটল গাড়ি যে যার পথে, 'ও দয়াভাই শুনছ?'
'কহিয়ে দাদা', বলল দয়া, 'এ যে কিছু দেখা যায় না-
ধুলোয় ঢেকেছে চারিপাশ'- 'ইঁহা জোর জোর মাত কহনা'।
'ও হো সরি সরি', মুশকিল ভারি ভুলে গেছিলাম আমি
জঙ্গলে জোরে কথা বলা মানা, এই কথাটাই দামি।
খানিকবাদেই চোখ হল সাফ গায়ে শীত কনকনে
পাতার ফাঁকে ভোরের সূর্য উঁকিঝুকি বনে বনে।
জঙ্গল চিরে সবুজ এ পথ এঁকেবেঁকে ছুটে যায়
আনমনা মন ইতিউতি চোখ কী যেন দেখতে পায়।
গাইড বলল, 'রুকো রুকো ভাই, উও দেখো এক চিতল'
হলদে শরীরে সকালের আলো কি দারুণ উচ্ছ্বল!
মুখে হাসি মনে খুশি জেগে ওঠে ক্যামেরায় ছবি চাই
ওমা! একী! গেলটা কোথায়? এই ছিল এই নাই?
লুকিয়ে পড়েছে ঘন সবুজের গভীর অন্তরালে
'রাস্তে মে উও ফির মিলেগা'-গাড়িটা আবার চলে।

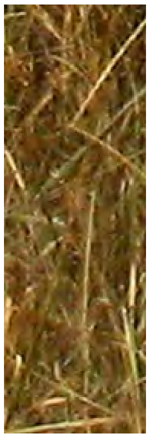

ফাঁকা প্রান্তর মেঠো রাস্তা লালচে পাতার ঝাঁক
বনের হাওয়ায় আজকে ওরা সঙ্গী হয়েই থাক।
বনবনানীর কোটর ফুঁড়ে রোদের ইচ্ছেচলা
এই অরণ্যে চুপটি থেকেও আমার কথা বলা।
বহেড়া, কেন্দু, আমলকী আর শাল-মহুয়ার দল
পাতাবাহারে হাত বাড়িয়ে মন চল, ছুটে চল।
চলতে চলতে তালাও তীরে একদল মৃগখেলা
জলপান চলে আপনমনে কোথায় শকুন্তলা?
রোদের গায়ে গা এলিয়ে শম্বর থাকে বসে
ডালে-আবডালে লুটোপুটি মন নাম না জানার শিসে।
এ অরণ্য ভারি অদ্ভুত পাহাড় দিয়ে ঘেরা
ছেলেপাহাড় আর মেয়েপাহাড়ে কী দারুণ বোঝাপড়া।
পাহাড়মাথায় রাজার প্রাসাদ, মন্দির, গুহা পাব
এখন সে সব থাকুক সেখানে পরেই বরং যাব।
সকাল থেকে হরিণ ছাড়া মিলল না তো কিছু
খালি মনে হয়, আসছে কী সে, আমাদের পিছু পিছু!
ভাবতে ভাবতে থামল গাড়ি, দয়া দেখাল রাস্তায়-
একটু আগেই সে গেছে এ পথে দেখলেই বোঝা যায়।
www.amaderchhuti.com
টাটকা বিরাট থাবার চিহ্ন ধুলোরাস্তার বুকে
গাইড জানাল, কাছেপিঠে আছে আজই দেখা যাবে তাকে।
বুকে চাপা খুশি, চোখে অপেক্ষা, মনে জাগে সংশয়
দেখা সে কী দেবে এতই সহজে! কী জানি, কী হয়?
পেরোল সময়, দিক শুনশান চোখ চলে যতদূর
ঝরা পাতা বুকে শুয়ে থাকে সুখে মর্মরধ্বনি সুমধুর।
পেছনে যে কটা গাড়ি এসেছিল সকলেই ফিরে গেছে
মুখ ফেরাতেই চোখের উপর ময়ূর এসে নাচে।
ময়ূর নাচে চোখের সামনে! একী জাগে বিস্ময়!
মনের জোরে বাঁধলে আশা এমনই বুঝি হয়।
বনের পথে রোদের আলাপে রঙের কলাপ মেলে
ময়ূর ডাকছে ময়ূরীকে আজ মিলনখেলার ছলে।
নাচে ঘিরিঘিরি নীলাম্বরী কণ্ঠে সাজে ওই
এমন দিনে মেঘমহারাজ তোমার কবিরা কই?
কোথায় তাদের কাব্যকবিতা, কোথায় গানের ধারা?
মন বলে দ্যাখ দুচোখ ভরে ভুবন দিশেহারা।
ছন্দে-বোলে নাচের তালে ময়ূর-ময়ূরী হারায়
সবুজে পাতায় নূপুর বাজে মনহারা ঠিকানায়।

ঠিকানা এবার সেন্টার পয়েন্ট, ঘড়িতে সোয়া আট
কেক-পাঁউরুটি-ডিম-কলা-কোলা প্রাতরাশ ঝটাপট।
এখানেই মেলে খবর - বাঘ দেখা গেছে ঠিক কোথায়
ট্যুরিস্ট-গাইড-ড্রাইভার সব সেদিকেই গাড়ি ছোটায়।
এরপর আর কোনও বাধা নেই সব গাড়ি সব দিকে
আমরাও তাই মুক্ত এখন খুঁজছি শুধুই তাকে।
বাঘ, শম্বর, হায়না, ভালুক, নীলগাই, চিঙ্কারা
ঝোপেঝাড়ে আছে গাউরের দল, হঠাৎ কীসের সাড়া!
একটু যেতেই বনগহিনে প্রচুর গাড়ির ভিড়
বাতাসের কানে শুধু কানাকানি মানুষেরা অস্থির।
নেই কোনও কথা চারপাশ চুপ কিছু হবে মনে হয়
কাছে দূরে থেকে থেকে শুধু যেন পশুপাখি ডেকে যায়।
গাইড জানাল, অ্যালার্ম কলে জানান দিচ্ছে ওরা
এখানেই আছে শের মহারাজ নিশ্চয় দেবে ধরা।
'ওই তো, ওই তো, দেখা গিয়েছে', চাপাস্বরে চিৎকার
বিদেশিনী বলে বিদেশির কানে, 'টাইগার-টাইগার'।

এ গাড়ি সে গাড়ি শুধু হুড়োহুড়ি ক্যামেরায় বাঘ ধর
গাছের ডালে না ওঠো যদি বাঘ দেখা দুষ্কর।
দয়াশঙ্কর জঙ্গল ঘেঁষে গাড়িটাকে দাঁড় করায়
হলে হবে কী এই পোড়া চোখ সকল কিছুই হারায়।
দুয়েকজনে দেখতে পেল, দাঁতের ফাঁকে আলো
শুনেই আমার হাড়-মাস আর পিত্তি জ্বলে গেল।
এরপরে ঠিক ঘটল যেটা কী ভাষায় যে বলি!
বনের ফাঁকে হঠাৎ দেখি ডোরাকাটা দাগগুলি।
ভাষাহীন মুখ নিশ্চুপ চোখ নিথর আমি তখন
গাড়িগুলো সব মুখ ঘোরাল বাঘ বেরোল যখন।
বাঘ দেখছি চোখের সামনে মাত্র ক'হাত দূরে!
বসল এসে রোদ বিছানো রাস্তারই উপরে।
রাজার চোখে চোখ রেখেছি নিশ্বাস আজ বন্ধ
দেখছি যা তা সত্যি নাকি অবচেতনের ধন্দ!?
এতকাল শুধু গল্পে শুনেছি, 'বাঘ আছে সেই বনে'-
ভাবিনি গল্প সত্যি হবে আমার এ জীবনে।
ঠিক কতক্ষণ বসেছিল সে বলতে পারি না তা
অবশ ছিলাম, খেয়াল ছিল না ঘড়ি দেখবার কথা।
যখন সে এই রাস্তা ছেড়ে তুলকি চালে দাঁড়ায়
সিংহ-আসন ছাড়ল রাজা আমার চোখের তারায়।
স্নায়ু -মগজের ভয়-নির্ভয় অনুভূতি একাকার
ইতিউতি চেয়ে বুঝিয়ে দিল সময় হয়েছে যাবার।
রাজার ইচ্ছে ঠ্যাকায় কে আর মুখ লুকাল জঙ্গলে
আগাছার ফাঁকে হলুদ -কালো মিশল শালের দঙ্গলে।
খেয়াল হল বাঘ বসেছিল আমার দুচোখ জুড়ে
নেই তো খাঁচার আড়াল, দেখেছি প্রকৃতির কোলে চড়ে।
বেড়েছে বেলা উঠছে শরীর রোদের আঁচে তেতে
ফুরোল সময় জানাল গাইড, রিসর্টে ফেরার পথে।
পরের সাফারি দুপুর তিনটে - এখন স্নানের পালা
ঠিক বারোটায় লাঞ্চ টেবিলে, এমনি ফুরোয় বেলা।
লেগে আসা চোখ তন্দ্রায় ডুব, ডাকল কী দয়াভাই?
হাতের ঘড়িতে টিক টিক টিক ঠিক বাজে তিনটাই।
আবার ছোটা জঙ্গল পথে অচেনা উত্তেজনা
এখন চলেছি পাহাড়মাথায় রাজবাড়ি ঠিকানা।
রাস্তাটা আগে একটাই ছিল দুভাগ হয়েছে এখন
একটি গিয়েছে শেষশয্যায় অন্যটি রাজপ্রাঙ্গণ।
www.amaderchhuti.com
মেঘলা বিকেল তবুও রোদেলা - লুকোচুরি খেলা চলে
পাহাড়িপথে ময়ূর-ময়ূরী নেচে যায় কল্লোলে।
কার মুখ দেখে কে জানে আমার সকাল জেগেছিল
দয়া বলল, এতদিনে তারা ময়ূরীরও নাচ দেখল।
বনের বুকে লাগল কাঁপন কম্পিত কলাপে
মুখর বিহান দিকবিদিকে কেকার প্রলাপে।
বেশিক্ষণ আর দাঁড়ালাম না মেঘ করে আসে আকাশে
উঠতে হবে অনেকটা পথ পাহাড়িয়া ঝোড়ো বাতাসে।

Photo: Avishek Chattopadhyay

গাড়িটা যেখানে থামল সেখানে আরও কয়েকটা সিঁড়ি
শায়িত বিষ্ণুচরণে চরণগঙ্গা তিরিতিরি।
পঁয়ত্রিশ ফুট মনোলিথ সেই কবে থেকে আছে শুয়ে
তবে থেকে এই গঙ্গার ধারা দিচ্ছে চরণধুয়ে।
সামনে বাঁধানো জলাশয়তেই চরণগঙ্গা মেশে
লোকে বলে, রাজঘর রয়েছে জলতলের শেষে।
উপর থেকে দেখা যায় কটা সিঁড়ি গিয়েছে নেমে
সাধ হয় বড়ো দেখি গিয়ে এই সিঁড়িটা কোথায় থামে।
অবাক লাগে, গায়ে কাঁটা দেয়, অনুভূতি দিশেহারা
ইচ্ছেগুলো আজকে যেন হঠাৎ সৃষ্টিছাড়া।

বিষ্ণুদেবের মাথার কাছে শিবলিঙ্গ বিশাল
পায়ের দিকে প্রাচীন ব্রহ্মা ঢেকেছে তরুর ছাল।

এবার চলা অন্যপথে দুর্গ-প্রাসাদ-মন্দিরে
পাকদণ্ডী পেরিয়ে সে এক ইতিহাসের অন্দরে।
ইতিহাস আজ চুরি করেছে কালচুরিদের কাল
বিষণ্ণ এই খন্ডহরে স্তম্ভিত মহাকাল।
শলমাজরির আব্রু ছেঁড়া নাচমহলের ঘুঙরু
বাউরি বাতাস শূন্য পেয়ালা ইতিকথা আজ পুরু।
পাশেই সাদা মন্দিরেতে মদনমোহন রাজে
নিত্যপুজো নিয়ম আচার ঘন্টাধ্বনি বাজে।
গাইড বলল, মন্দির ঘিরে রয়েছে বারোটি তালাও
একটি চোখে পড়ল যদিও বাকিগুলো যেন উধাও।
পায়ে পায়ে চলা প্রাচীন দুর্গ উঁচুনিচু পথ সাবধান
দরজা ঠেলে চামসে গন্ধ বাকি চোখে অনুমান-
এইটা বোধহয় এমন ছিল, ওইটা আজ কই?
সবটুকু আজ কালের অতল তেমন কিছুই নাই।
ইচ্ছে হতেই প্রশ্ন করি, 'এখানে কী বাঘ আসে?'
বড়ো বড়ো চোখে জানাল গাইড, বাঘ নির্জন ভালোবাসে -
লোকে বলে শুনি, মাঝে মাঝে আসে এইটা তাদের ডেরা।
কী সব্বোনাশ! একটাও যদি এসে বলে, 'কী হে ছোকরা-
সকালে তো খুব ছবি তুললি; এবার তোর ছবি তুলি, দাঁড়া'।
শোনামাত্রই ছুটিয়ে গাড়ি পাহাড় বেয়ে নামা
এদিক-ওদিক কোনওদিক নয় বড়াগুহাতেই থামা।
পাহাড়ের মাঝে জং ধরা গেট ভিতরেতে ঘনকালো
মাথার চালে ছোটো গহ্বর ঢুকছে চিলতে আলো।
চারিধার ভরা সারি সারি ঘর রাজ আমলের দরবার
চামচিকে আর বাদুড়ের বাস জমাট অন্ধকার।
মন্ত্রী-সান্ত্রী, উজির-রাজা, সভাসদ, আমলারা
সময়ের বিষে হারিয়ে গিয়েছে ইতিহাস আজ তারা।
বাইরে আকাশে মেঘ করেছে বিকেলটা তাই ফ্যাকাসে
দেরি না করে ছুটল গাড়ি বৃষ্টিধোয়া বাতাসে।
বৃষ্টি এল ঝিরঝিরঝির খানিক পরে অঝোর
ঘিরে থাকা ঘোর অরণ্যে আমি একলা বৃষ্টিবিভোর।
আধভেজা মন আধো অচেতন ভেজা ভেজা বুনো গন্ধ
www.amaderchhuti.com
সবুজের দলে জলের মিছিলে বাজছে আদিম ছন্দ।
উড়ে আসা মেঘ হঠাৎই উধাও বৃষ্টি সঙ্গে নিয়ে
যেটুকু জল গাছের শাখায় সেটুকু ঝরছে গায়ে।
চিকন চিকন রোদ হেসে যায় ভেজাপাতার ফাঁকে
চলতে চলতে আবার থামি অচিন সুরের ডাকে।
ছোটো থেকে এক কথা মানি মনে, কোনও কিছু ভালো হলে
সবার আগে ঝড় বয়ে যায় জীবনের চলাচলে।
খানিক আগের বৃষ্টি-ঝড়ে তেমনই কি ইশারা?
কেমন যেন থমথমে এই ঘাসজমিটার কিনারা।
সামনে বিরাট বিস্তৃতি তার দূরে বনের রেখা
এপাশে -ওপাশে চোখ চারপাশে কেউতো দেয় না দেখা।
একটা -দুটো, পাঁচটা -ছ'টা গাড়িগুলো একে একে
হাজির হয়ে বনের ধারে চুপটি দাঁড়িয়ে থাকে।
ছোটো -বড়ো কত ক্যামেরার ঝাঁক শিকারির ওত পাতে
হে ঈশ্বর, কৃপা কর ফের তার দেখা পাই যাতে।
ঠিক তখনই ওই দেখা যায় হলুদ ঘাসের আড়াল
এক পা -দু'পা চোখের উপর, নয়তো হাতের নাগাল।
তবুও স্পষ্ট হলুদ -কালোয় আহ্লাদে আটখানা
গাইড জানাল, বাঘিনি এটা, বাঘ কিন্তু না।
ভালোই হল সকালে মামা বিকেলে মামির দেখা
কিন্তু এ কী! খোঁড়ায় কেন? শেষ পা -টা কী ব্যাঁকা?
না না ব্যাঁকা নয়, মাস তিন আগে ফুটেছে সজারু কাঁটা
বনের পথ্য মিথ্যে সবই চিকিৎসাতে ভাটা।
আহা! কতই কষ্ট কত যে ব্যথা চলার গতি রোধে
ওর পায়ের কাঁটা কীভাবে আমার বুকেতে এসে বেঁধে!
দুপাশে ঘাসের বাদাড় ঠেলে মাঝের শূন্য বনে
একলা অবলা বাঘিনি এবার বসল আপন মনে।
প্রতি মুহূর্তে শুষি আনন্দ মানুষ ভিন্ন ভিন্ন
সভ্য সমাজে বাঘিনি রাখল বিরাট প্রশ্নচিহ্ন।
"জঙ্গলে আস জন্তু দেখতে পয়সা উশুল চাও,
জঙ্গল মানে ফেলে যাওয়া ঘর তোমরা কী টের পাও?
অবহেলা কর, যন্ত্রণা দাও তবু দিয়ে যাই ধরা
আমরা না হয় জানোয়ার সব, কিন্তু তোমরা কারা??"

প্রশ্নগুলো উত্তরহীন, দিন শুধু নিভে আসে
আদুল শরীর ধীরে মিশে যায় হলুদরঙা ঘাসে।
রঙে মিলে যায় অনাঘ্রাত প্রকৃতির সান্ত্বনা
আকাশে -মেঘে রক্তিম চিঠি বিপন্ন চেতনা।

~ তথ্য- বান্ধবগড় ~ || ~ বান্ধবগড়ের ছবি ~

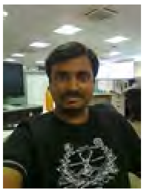

ট্র্যাভেল ছুটি পত্রিকার সহ সম্পাদক এবং একটি বাংলা টি.ভি. চ্যানেলের স্ক্রিপ্ট লেখক অভিষেক ভালোবাসেন বেড়ানোর কথা লিখতে।

www.amaderchhuti.com

Rate This : - select -
Total Votes : 1
Average : 1.00

Like Be the first of your friends to like this. tell a Friend

Post Comments

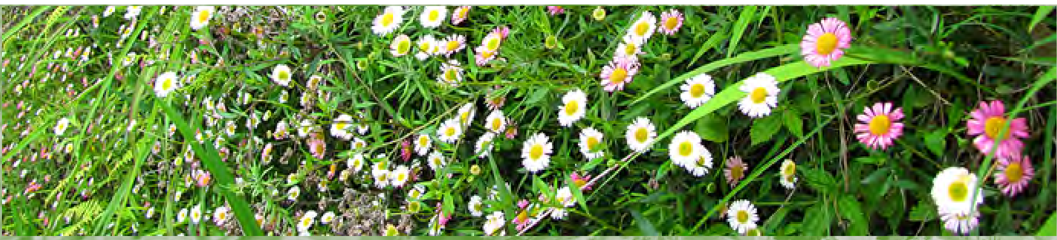

আকাশের কথা সাগরের কানে

দময়ন্তী দাশগুপ্ত

~ গোয়ার তথ্য ~ ‖ ~ ছবি - উত্তর গোয়া - দক্ষিণ গোয়া ~

ভিডিয়ো ক্যামেরার স্ক্রিনে বৃষ্টির ফোঁটা। সরে সরে যাওয়া ঘনসবুজ বারবার ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। মেঘলা সকালে অমরাবতী এক্সপ্রেস ছুটে চলেছে ভগবান মহাবীর ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারির পাহাড়-জঙ্গলের বুক চিরে। দুধসাগর - স্টেশনের নামটা চোখে পড়তেই সকলেই সতর্ক ক্যামেরা হাতে অথবা উৎসুক চোখে। ঠিক করতে পারছিলাম না ঠিক কোনটা করব -দুচোখ ভরে দেখব ওই অপরূপ দৃশ্য নাকি আনপড় হাতে ধরা ক্যামেরাতেই চোখ লাগাব। ভাবতে ভাবতেই জানলার সামনের পাহাড়-সবুজ সরে গিয়ে দুধসাদা ঝরনার প্রশস্ত ক্যানভাস। সবুজ পাহাড়ের গা বেয়ে প্রায় ছ'শো মিটার উচ্চতা থেকে নামছে মান্ডবীর ফেনিল সাদা জলধারা -হঠাৎ যেন চোখটা ধাঁধিয়ে গেল। কিন্তু মাত্র কয়েক সেকেন্ডের এই প্রাপ্তি। বাঁক ঘুরতে অন্য জানলায় আর এক ঝলক। তারপর - এই জানলায়-ওই জানলায় - দূর থেকে আরও কিছুক্ষণ।

Photo: Ratnadip Dasgupta

সমুদ্রকে যদি নারীর সঙ্গে তুলনা করা যায় তাহলে গোয়া চির লাস্যময়ী। অদ্ভুত একটা মাদকতা ছড়িয়ে আছে সমুদ্র সৈকতে, সৈকতঘেঁষা বিচ রেস্টুরেন্ট আর অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস রাইডে কিম্বা শহরের বুকের ঘনসবুজে।

মারগাঁও থেকে যখন কোলভা পৌঁছোলাম তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে -ঝমঝমিয়ে এসেছে বৃষ্টি। বৃষ্টি থামতেই হাজির হলাম সৈকতে। নারকেল গাছে ছাওয়া ভেজা ভেজা বেলাভূমিতে তখন পর্যটকদের ভিড়। ওরই মাঝে ওয়াটার স্কুটার আর প্যারাসেলিংয়ের হাঁকডাক।

www.amaderchhuti.com

বিচ-লাগোয়া রেস্টুরেন্টে - গোয়ায় যাকে বলে 'শ্যাক' - বসে মৃদুমন্দ আলোয় অক্টোপাসের একটা দুর্দান্ত ডিশ। বাইরে ঝমঝম বৃষ্টি। বৃষ্টি কমলে বেরিয়ে পড়ি। রাস্তার ধারে আলোঝলমলে সব দোকান আর রেস্তোঁরা। পর্তুগিজ সুরের টানে ঢুকে পড়ি আরেকটা রেস্তোরাঁয়। বাইরে পাতা টেবিল চেয়ারে বসে পড়ি আইসক্রিম নিয়ে। সামনেই কীবোর্ড-গিটার নিয়ে বসে গান গাইছেন যিনি তাঁর নাম গারুদা -দ্য ওয়ান ম্যান ব্যান্ড।

Photo: Ratnadip Dasgupta

অক্টোবরের এই সময়ে কোলভায় আওয়ার লেডি অব মার্সি চার্চে শিশু যিশুখ্রিস্টকে ঘিরে উৎসব চলে -বসে যায় মেলা। মা মেরির কোল থেকে নেমে ছোট্ট যিশু কয়েকদিনের জন্যএখন সকলের আপনজন। সবাই চুমু খাচ্ছেন চার্চের ফাদারদের কোলে থাকা ছোট্ট পুতুল যিশুর পায়ে। আমার মেয়েও বাদ পড়েনা।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়ে পড়লাম সাউথ গোয়া ট্যুরে। প্রাচীন পর্তুগিজ অধ্যুষিত গোয়ার জীবনযাত্রা সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছে লিউটোলিমে। এটি স্থানীয় এক পর্তুগিজ ভদ্রলোকের ব্যক্তিগত উদ্যোগ - যাকে প্রোমোট করছে গোয়া ট্যুরিজম। মাথাপিছু দেড়শো টাকার টিকিট করে ঢুকতে হল। পড়ার ঘর থেকে রান্নাঘর সবই নিখুঁতভাবে সাজানো। সব ঘুরেটুরে বীরেন মন্তব্য করল, এবার কলকাতায় ফিরে ওদের বাড়িটার (তা শ'খানেক বছরের পুরোনো তো হবেই) যা যা রেনোভেশন করেছে সেগুলো আবার বদলে আগের মত করে চাট্টি আরশোলা ছেড়ে দেবে। তাহলে দেড়শো না হোক একশো টাকা পার হেড টিকিট করাই যেতে পারে।

উলটোদিকে বিগফুট মিউজিয়াম। পাথরের ওপর একটা বড় পা-এর নির্দশন পাওয়া গেছে, তাই এই নাম। একশো বছর আগে গোয়ার গ্রাম্যজীবন কেমন ছিল সেটাই তুলে ধরা হয়েছে বিভিন্ন মডেলের মাধ্যমে।

ছোট্ট একটা মোমের পুতুলের মিউজিয়াম দেখে পরবর্তী গন্তব্য শান্তাদুর্গা ও শ্রীমঙ্গেশ মন্দির। শিবাজির পুত্র শম্ভুজি শান্তাদুর্গার মন্দিরটি নির্মাণ করেন। এখানে দুর্গা শান্তরূপে অধিষ্ঠিত। বিখ্যাত গায়িকা লতা মঙ্গেশকরের গ্রামেই রয়েছে শ্রীমঙ্গেশ মন্দির। তবে তুমুল বৃষ্টিতে প্রায় কেউই মন্দিরদুটি ভালো করে দেখতে পেলেন না। সাউথ গোয়া ট্যুরের সেরা আকর্ষণ ওল্ড গোয়া। সত্যি বলতে কী আলাদা করে না এলে এখানকার অপূর্ব সুন্দর চার্চগুলো প্রাণভরে দেখা হয়ে ওঠেনা। মেঘলা দুপুর, চার্চের শান্তস্নিগ্ধ পরিবেশ সবমিলিয়ে মনটা কেমন অন্যরকম হয়ে যাচ্ছিল। ৬০৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল ব্যাসিলিকা ডি বম জেসাস। বিশ্বাসীদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র এই গির্জায় বিশেষভাবে রক্ষিত আছে সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ারের দেহ। তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুসারে মৃত্যুর পরে চিন থেকে গোয়ার এই চার্চে দেহটি আনা হয়। প্রতিবছর ৩ ডিসেম্বর জেভিয়ারের মৃত্যুদিনকে স্মরণ করা হয়। দশবছর অন্তর তাঁর দেহ সর্বসাধারণের জন্য প্রদর্শন করা হয়। লাল ল্যাটেরাইট পাথরে আইয়োনিক, ডোরিক ও কোরিন্থিয় রীতিতে নির্মিত এই চার্চটির অভ্যন্তরে অসাধারণ ম্যুরাল চিত্রে ফুটে উঠেছে সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ারের জীবনকাহিনি। চার্চের প্রধান বেদির নীচে বম জেসাসের বা শিশু যিশুর মূর্তি।

ব্যাসিলিকা-ডি-বম-জেসাসের উলটোদিকে গোয়া তথা এশিয়ার বৃহত্তম চার্চ সে ক্যাথিড্রাল। সাদা রঙের প্রাসাদের ন্যায় পর্তুগাল ও গথিক স্থাপত্যের এই চার্চটি ১৫৬২-১৬৫২ প্রায় নব্বই বছর ধরে তৈরি হয়েছিল। প্রাসাদের বর্হিভাগ তাসকান রীতিতে এবং অন্তর্ভাগ কোরিন্থিয় স্টাইলে নির্মিত। চার্চের মূল বেদির ওপরে যিশু ও নীচে মাতা মেরির মূর্তি। সবচেয়ে নীচে পর্তুগালের রানি সেন্ট ক্যাথরিনার মূর্তি। চার্চটিও সেন্ট ক্যাথরিনার উদ্দেশ্যেই উৎসর্গীকৃত। চার্চটির মধ্যে একেকটি প্রকোষ্ঠে একেকটি মূর্তি রয়েছে -আওয়ার লেডি অফ হোপ, আওয়ার লেডি অফ লাইফ, আওয়ার লেডি অফ থ্রি নিডস ইত্যাদি। সহ্যাদ্রি পর্বত থেকে পাওয়া হোলি ক্রশটিও সযত্নে রক্ষিত আছে চার্চে। দেওয়ালের ম্যুরালে ফুটে উঠেছে সেন্ট ক্যাথরিনার জীবনকাহিনি। আগে ক্যাথিড্রালটির দুটি চূড়া ছিল। এখন কেবলমাত্র উত্তরের চূড়াটিই আছে। এখানেই রয়েছে বিখ্যাত গোল্ডেন বেল। বিরাট এই গোল্ডেন বেল-এর ঘন্টাধ্বনি ছড়িয়ে যায় গোয়ার প্রান্তে -প্রান্তরে।

Photo: Ratnadip Dasgupta

এদিনের শেষ দর্শন ডোনা -পাওলা বিচ। এই সৈকতের সঙ্গে যতটাই রোম্যান্টিক কাহিনি জড়িয়ে থাক না কেন কংক্রিটে বাঁধানো সৈকতটি ঠিক ততটাই আনরোম্যান্টিক। কংক্রিটের পথের পাশে একের পর এক দোকানে হরেকরকম পশরা পেরিয়ে রেলিংয়ের ধারে দাঁড়ালে নীচে সমুদ্র আর দূরে ভাস্কো বন্দরে দাঁড়িয়ে থাকা জাহাজগুলোর আউটলাইন। ডোনা পাওলায় আসার পথে উপরি পাওনা মিরামার সৈকত – রাজধানী পানাজি-র একমাত্র সী বিচ -মান্ডবী নদী যেখানে আরবসাগরে পড়েছে।

বিকেলে হোটেলে ফিরে একটুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়ি সাগরবেলার দিকে। সন্ধে পেরিয়ে রাত নামছে -মায়াবী হয়ে উঠছে গোয়া। সৈকত ধরে হাঁটতে হাঁটতে লাগোয়া একটা রেস্টুরেন্টে বসি -সান্ধ্যআহার – সিফুড এবং পানীয় সহযোগে। আমি অবশ্য ছোটদের ফ্রুট জুসের ভাগিদার। সৈকতে পেতে রাখা চওড়া বিচচেয়ারে গা এলিয়ে দিই। আড্ডা চলে, মাঝে মাঝে নিস্তব্ধতা -একলা সাগরের গান।

নর্থ গোয়া পৌঁছে কালাঙ্গুটে সৈকতে পা রাখলে প্রথমেই মনে পড়ে পুরীর সৈকতের কথা - বাপরে কী ভিড়! লোক একেবারে গিজগিজ করছে -সুইমিং কস্টিউম পরা সাহেব -মেমসাহেব থেকে বাঙালি -অবাঙালি আমজনতা। ওয়াটার স্কুটার, ব্যানানা রাইড, প্যারাসেলিং -এর হাঁকাহাঁকিতে কান পাতা দায়। সৈকতে একটা ঢুঁ মেরে আমরা চললাম অটোতে আঞ্জুনা বিচে। বুধবার, ফ্লি মার্কেট বসবে। যদিও বেশ দেরিই হয়ে গিয়েছিল। পৌঁছে দেখি দোকানপাট সব গোটাতে শুরু করেছে। জামাকাপড় থেকে পুরোনো ঘড়ি-কম্পাস-শৌখিন হুঁকো, ঘর সাজানোর রকমারি নিয়ে বসা স্থানীয় দোকানিদের পাশাপাশি বিদেশি-বিদেশিনীরাও বসে গিয়েছিল টুকিটাকি-র পশরা সাজিয়ে – এখন ভাঙা হাটে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে ঘরে ফেরার পালা – আবার পরের বুধবারের অপেক্ষায়। সন্ধেবেলায় আবার সৈকতে। চারপাশে জমজমাট বাজার চলে গেছে একেবারে সৈকতের মুখ পর্যন্ত। সৈকতের গায়েই বেশ ক'টা বড়বড় রেস্টুরেন্ট। কোলভার নির্জন রহস্যময়ী চরিত্রটা এখানে একেবারেই অনুপস্থিত, এ যেন বড় বেশি ঝলমলে, উচ্ছ্বল, উজ্জ্বল।

পরদিন নর্থ গোয়া ট্যুর। সাউথ গোয়া ট্যুরের মতোই বাসে উঠে গাইড বলতে শুরু করলেন আমাদের গন্তব্যের কথা। তবে আজ শুরুটা একটু অন্যরকম। লিস্টে যে জায়গাগুলোর নাম আছে অদলবদল হয়ে ঢুকে পড়েছে নতুন সৈকত কোকোবিচ। ওখানে নাকি দেখা মিলবে ডলফিনের। রোদ বেশ চড়া। সৈকতের পাশে বাস দাঁড়াতে নীচে নেমে পায়ে পায়ে সবাই মিলে বোটের দিকে এগোনো। বিচের গা বেয়ে উঠে গেছে সবুজ পাহাড়। পাড়ের কাছে রঙিন রঙিন বোটের সারি। নীল -সবুজ জল কেটে তিরতির করে আমাদের বোট চলেছে - ঢেউয়ের মাথায় কি ডলফিন লাফিয়ে উঠল? সকলেরই উৎসুক দৃষ্টি, হাতের ক্যামেরা তাক সেই দিকে - ওই যে, ওই যে। ওরই ফাঁকে গাইড দেখান পাহাড়ের গায়ে নারকেল গাছের সারির ফাঁকে ফাঁকে 'হাসিনা মান যায়েগি'-র শুটিং বাংলো, সেন্ট্রাল জেল। কোকো বিচ থেকে বেশ কিছুটা ওপরে উঠে এসে আগুয়াদা ফোর্ট- মান্ডবী আর জুয়ারি নদীর সঙ্গমে। একসময় এই দুর্গে অনেকগুলি ঝরনা ছিল। পানীয় জল নিতে জাহাজ ভিড়ত এই দুর্গের কাছে। 'আগুয়া' শব্দের অর্থও জল। দুর্গের একাংশই এখন সেন্ট্রাল জেল। আলবার্তো পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত এই দুর্গেই রয়েছে দক্ষিণ -পূর্ব এশিয়ার প্রাচীনতম লাইট হাউসটি। সিঁড়ি ভেঙে দুর্গের ওপরে উঠে আসি। ছড়ানো-ছেটানো অনেকটা জায়গা জুড়ে ট্যুরিস্টের ভিড়। এখান থেকে সমুদ্র ভারি সুন্দর।

দুপুরে মায়েম হ্রদের তীরে গোয়া ট্যুরিজমের রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ ব্রেক। রেস্টুরেন্ট থেকে নিচে সবুজ পাহাড়ে ঘেরা টলটলে জলের হ্রদটা ভারি ভালো লাগছিল।

Photo: Ratnadip Dasgupta

এই তো ক'দিন ধরে গোয়া ঘুরছি, তবু কেন জানি না মন ভরছে না। আসলে আমাদের তো হাত বাড়ালেই সমুদ্দুর -পুরী, দিঘা - ধূসর জলে ঢেউয়ের খেলা। আন্দামানের নীল সমুদ্র সবুজ পাহাড় মনের আঁখিতে ফিরে ফিরে আসছে। আর তাই রূপসাগরের ঠিকানা মিলছে না। গোয়ার নির্জন সৈকতগুলোতে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। কিন্তু ভাগাতোরে পৌঁছে এবার সত্যিই মুগ্ধ হলাম। পাথর-পাথর সৈকত পেরিয়ে বেলাভূমি। নীলসাগরের গা থেকে উঠে গেছে ঘন সবুজ পাহাড়। কোথাওবা পাহাড়-সাগরের মাঝে বেড়া টেনেছে নারকেল গাছের সারি। সৈকতের এখানে -সেখানে স্বল্পবাস বিদেশি-বিদেশিনীর রোদ্দুর পোহানো। কোথাওবা নিভৃতে দুজনে সৈকতে -পাহাড়ে। মাঝে আমাদের মতো আলপটকা কিছু ট্যুরিস্ট। ঢেউয়ে পা ভিজিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে যাই। সবুজ পাহাড়টা যেখানে ঝুঁকে এসে কথা বলতে চাইছে সাগরকন্যার সঙ্গে। ডাক আসে, বাস ছাড়ার সময় হয়ে এল। গলা তুলে দীপকে বলি, এখানেই থেকে গেলে হতো না কি?

আঞ্জুনা সৈকতটা একেবারে রঙিন রঙিন ছোট্ট ছোট্ট পাথরে বোঝাই। সমুদ্র আর দেখব কী, পাথরের কত রং লাল, সবুজ, হলুদ, বাদামি, সাদা, কালো -ইস কী সুন্দর! এইটা নিই মা, মেয়ে বলে, মাও ব্যস্ত সাগরসৈকতে নুড়ি কুড়োতে। দুজনেই মাথার টুপি বোঝাই করি রঙিন রঙিন নুড়ি পাথরে। মেয়ের বাবা বলে, এত পাথর তোমরা নিয়ে যাবে! না, না, সব কী আর নেব, আশ্বাস দিই, মানে, বেশি বইতে হবে না তোমাকে আর কী!

সন্ধ্যায় পানাজি ফিরে মান্ডবী নদীর বুকে বোট ক্রুইজ দিয়ে আজকের যাত্রা সারা। শহরের বুক ছুঁয়ে ছুঁয়ে মান্ডবী চলেছে মোহনার দিকে। নদীর তীরের ঘন সবুজের ফাঁকে ফাঁকে বাড়ি-ঘর, গাড়ির রাস্তা, আর রসভঙ্গকারী এল আই সি, এয়ারটেলের হোর্ডিং। জলে ভাসছে আরও বোটগুলো, মাঝে মাঝে ছোট জাহাজ। নদীর জলে আবির গুলে সূর্য ডুবছে, বোটের ওপর বদলে বদলে যাচ্ছে গানের কথা - সুর -গায়ক -গায়িকা, নাচের দল। অন্ধকার নেমে এসেছে। আলোর মালায় সেজে উঠছে পানাজি। কালো জল কেটে এগিয়ে যাচ্ছে আলোয় ভরা জাহাজ।

রাতে কালাঙ্গুটে ফিরে দেখি বিচের পাশের রেস্টুরেন্টগুলো চেয়ার-টেবিল পেতে দিয়েছে বিচের ওপরে – টেবিলে-টেবিলে জ্বলছে প্রদীপ – নরম হলুদ আলোয় -ভেসে আসা পর্তুগিজ সুরে রোম্যান্টিক হয়ে উঠেছে সাগরবেলা।

একেকটা সকাল হঠাৎ করে ভারি সুন্দর হয়ে যায়, কেমন জানি অন্যরকম। পরদিন বেশ সকালে উঠে কালাঙ্গুটের সৈকত ধরে হাঁটছি। তখন নির্জন। হাঁটতে হাঁটতে প্রায় বাগা বিচের কাছাকাছি। সমুদ্রের ধারে পাতা আরামকেদারায় তখনও অলস সকাল। রেস্টুরেন্টগুলো খোলেনি। তাই বসবার দাম চাইবার লোকও নেই। দিব্যি হাত-পা ছড়িয়ে চুপ করে আধশোয়া হয়ে বসে আছি। সামনে একটু একটু করে সমুদ্রের বুকে সকাল স্পষ্ট হচ্ছে। বাড়ছে লোকজনের আনাগোনা। তবু কেমন শান্ত চুপচাপ সমুদ্রের মুখোমুখি হারিয়ে যাওয়া নিজের সঙ্গে। 'কখন আসে একটি সকাল সে যেন মোর পথেই বাঁধে বাসা সে যেন মোর চিরদিনের চাওয়া'-মোবাইলের আলতো গানের কলি কানের কাছে -হাঁটতে হাঁটতে ফিরে আসি। দেখি মাছধরার নৌকা ফিরেছে, চলছে জাল থেকে মাছ সংগ্রহের পালা। রোদ উঠেছে। সার দেওয়া রঙিন রঙিন ছাতার নীচে আরামকেদারায় আয়েশ, বডি ম্যাসেজের আরাম নেওয়া। সমুদ্দুরের জলে স্নান আর জলখেলা। ব্যানানা রাইডের হলুদ বোটের কাত হয়ে শুয়ে থাকা সৈকতে, যাত্রী পেলেই জলে দৌড়ানো।

আজ সারাদিন ইচ্ছেমতো সমুদ্রস্নান, কেউ ওয়াটার স্কুটারে জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে, কেউ নীল আকাশে প্যারাসেলিংয়ে, কেউ বা সেরে নেবে সব শপিং। ওরই মধ্যে ফের ঝমঝম বৃষ্টি, সাগরে আকাশে মাখামাখি।

~ গোয়ার তথ্য ~ ‖ ~ ছবি - উত্তর গোয়া - দক্ষিণ গোয়া ~

লেখালেখি, সম্পাদনা আর সাংবাদিকতাই দময়ন্তীর ভালোলাগা। এই সূত্রেই যুক্ত রয়েছেন বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সঙ্গে।

www.amaderchhuti.com

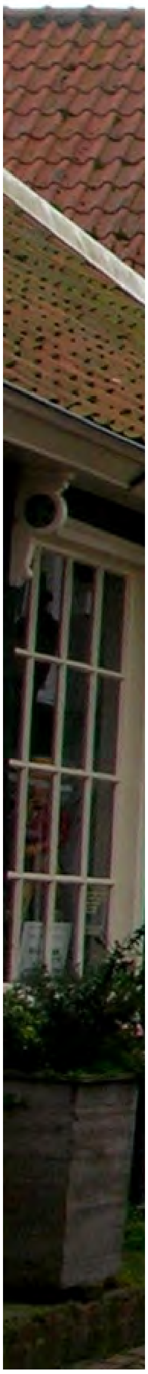

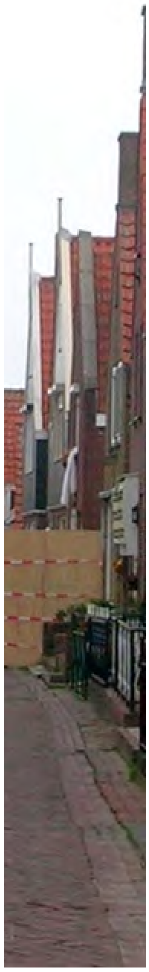

ভলেনডাম - টুকরো গানের কলি

মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

~ তথ্য- ভলেনডাম ~ ‖ ~ ভলেনডামের ছবি ~

পাখিগুলো চারপাশ দিয়ে আমাদের ঘিরে ধরেছে। দেখতে অনেকটা মাছরাঙার মতো। তবে অত রঙিন নয় বরং বেশ ধূসর চেহারা। তীক্ষ্ণ ঠোঁটে হাত থেকে ঠোক্কর মেরে মাছভাজা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। আবার হাত-পা নেড়ে তাড়াতে গেলেই টুক করে উড়ে যাচ্ছে।
পাখিদের ভিড় থেকে মাথা তুললে চোখে পড়ছে মেঘলা আকাশ আর আইজে নদীর জলে তার প্রতিচ্ছবি। সকালেই এসে পৌঁছেছি ছবির মতো ছোট্ট সাজানো গোছানো গ্রাম ভলেনডামে। আমস্টারডামের হট্টগোল পেরিয়ে শান্তস্নিগ্ধ ভলেনডামে পৌঁছে ভারি ভালো লাগলো। গ্রাম বলতে আমাদের চোখে যে ছবিটা ভেসে ওঠে তার সঙ্গে ভলেনডামের কোনও মিলই নেই। চওড়া রাস্তার দু'পাশে লাল রঙের ছাদওয়ালা বাড়িগুলো সার দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সব বাড়িই প্রায় একইরকম, আলাদা করে চেনা যায় না। গাড়িঘোড়া প্রায় নেই বললেই চলে। তীব্র নিস্তব্ধতা ভাঙছে পাখির গানে অথবা রাস্তা দিয়ে গ্রামবাসীদের সাইকেলে করে যাওয়ার সময় ঘন্টির টিং-টিং আওয়াজে।
গ্রামের গা ঘেঁষে বয়ে চলেছে আইজে নদী। আইজে নদীর মুখে অবস্থিত এই গ্রামের একমাত্র বন্দর এদাম। তীরের কাছে জেলেদের নৌকাগুলো বাঁধা রয়েছে। জেলে নৌকাগুলো দেখতে অনেকটা ডিঙির মতো। তবে ডিঙির থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী, মজবুত ও আকারে বেশ বড়। বেশিরভাগ মানুষই জেলে। বাকিরা চাষ-আবাদ করেন।

www.amaderchhuti.com

সকাল থেকেই বেশ মেঘলা। মাঝে মাঝেই ঝিরঝিরে বৃষ্টিটা বাড়ছে। আবার ওরই ফাঁকে ফাঁকে কখন একঝলক রোদ্দুর -মেঘের গায়ে ঝলসে উঠছে রামধনুর সাত রং। ভলেনডাম গ্রামে মাছের স্টলগুলো সংখ্যায় অনেক -বন্দরের ধারে নদীর গা ঘেঁষে বানানো। কিছুটা কলকাতার বেনফিশের স্টলগুলোর কথা মনে পড়িয়ে দেয়। স্টলের ভেতরে রয়েছে ইভাকশান কুকার আর মাছভাজার যাবতীয় সরঞ্জাম। প্রতিটি স্টলেই বসে আছেন ওলন্দাজ গ্রামবাসীরা বিভিন্নরকমের মাছভাজার তালিকা হাতে নিয়ে। তালিকায় রয়েছে বেশ কয়েকরকমের মাছভাজার নাম, পাশে মূল্যগুলো লেখা। ফিশ ফ্রাই, ফিশ বল, শুধু ছাঁকা তেলে মাছভাজা আরও কত কী! খেতে হবে মাস্টার্ড সস অর্থাৎ কাসুন্দি মাখিয়ে। স্টলগুলোয় বসার জায়গা নেই। হাতে কাগজের প্লেট নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারিয়ে তারিয়ে খাওয়া। মেঘলা দুপুরে ঝিরঝিরে বৃষ্টির ব্যাকগ্রাউন্ডে ঠান্ডা হাওয়ার কামড় আর গরমাগরম হেরিং মাছভাজা খেতে খেতে আমরা উপভোগ করতে থাকলাম ভলেনডাম গ্রামটির নিসর্গচিত্র। তবে পাখিদের ব্যারিকেড আর হাত থেকে ঠোক্কর মেরে কেড়ে খাওয়ার চেষ্টার চোটে অন্য কোনওদিকে ঠিকমতো মনও দেওয়া যাচ্ছে না।
নেদারল্যান্ডস-এর নর্থ হল্যান্ডে অবস্থিত এই গ্রামটির ইতিহাস কিন্তু বেশ প্রাচীন। বৃষ্টিভেজা দুপুর -বিকেলে গ্রামের পথে হাঁটতে হাঁটতে শুনতে থাকি আমাদের ট্যুর গাইডের মুখে। ১৩৫৭ খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় কৃষক ও মৎস্যজীবিরা মিলে এখানে জনবসতি গড়ে তোলেন। পরবর্তীকালে মূল বসতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছোট একটি ক্যানেল আলাদাভাবে কেটে, তারপর জলাজমি ভরাট করে নতুন করে গ্রামটি গড়ে তোলা হয়। গ্রামের নামটির উৎপত্তিও সেইসময়। "ভলেনডাম" শব্দের আক্ষরিক অর্থ ভরাট করা ড্যাম। গ্রামটি এতই মনোরম যে পাবলো পিকাসো ও রেনোয়ার মত বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বেরা এখানে বারবার এসেছেন ক্ষণিকের নিরিবিলি কাটানোর নেশায়।
পরেরদিন সকালবেলায় আমরা পৌঁছোলাম ভলেনডামের বিখ্যাত 'ক্লগস' ফ্যাক্টরিতে। 'ক্লগস' হচ্ছে একরকমের কাঠের জুতো যা পায়ে দিয়ে এই গ্রামের চাষি ও জেলেরা কাজ করেন। এখন অবশ্য রোজকার জীবনে ক্লগসের ব্যবহার অনেকটাই কমে গেছে। বরং পর্যটকরা এখান থেকে স্যুভেনির হিসেবে ক্লগস সংগ্রহ করেন।
কাঠ চেরাই ও খোদাই করার কাজ মূলত হাতেই করা হয়। বিভিন্ন আকারের ও মাপের জুতোগুলো কাটা হয়ে যাওয়ার পর কিছুটা মেশিনে, কিছুটা হাতে ক্লগসগুলো বানিয়ে ফেলা হয়। ক্লগসগুলো দেখে বেশ অবাক আর মজাও লাগছিল। বড়সড় একজোড়া ক্লগস পায়ে গলিয়ে ছবি তুলে ফেললাম। তারপর স্যুভেনির হিসেবে কিনেও ফেললাম কয়েকজোড়া ছোট ছোট রঙিন ক্লগস।
ক্লগস ছাড়াও ভলেনডাম গ্রামের কৃষকেরা খেত খামারে কাজ করার সময় পরে থাকেন বিচিত্র এক কালো রঙের পোশাক, যা তাঁদের লোকসংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কালো জোব্বার মতো জামা, মাথায় বিচিত্র কালো টুপি বা বনেট আর পায়ে ক্লগস জুতো -এই হল নেদারল্যান্ডসবাসীদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক। বহু যুগ ধরে নারীপুরুষ নির্বিশেষে এই পোশাক পরে মাঠেঘাটে কাজ করার রীতি চলে আসছে। নবীন প্রজন্মে অবশ্য এই চল এখন আর নেই বললেই চলে। ভলেনডাম গ্রামে হয়তো জনা পঞ্চাশ প্রবীন মানুষকে আজও এই পোশাকে কর্মরত দেখা যাবে। অদূর ভবিষ্যতে এই পোশাক পরার রেওয়াজটাই হয়তো একেবারেই হারিয়ে যাবে।
ভলেনডামের আরেক দ্রষ্টব্য ওয়াইন ও চিজ তৈরির কারখানা। ট্যুরের তৃতীয় দিনে আমরা এই ফ্যাক্টরিটি দেখতে গিয়েছিলাম। এখানে দেখলাম কীভাবে নানারকম চিজ ও ওয়াইন তৈরি হচ্ছে। তবে শুধু দেখেই সন্তুষ্ট হওয়া নয়। চেখেও দেখলাম নানাধরনের অপূর্ব স্বাদের সব ফ্রুট ওয়াইন। খুবই মিষ্টি খেতে। বিশ-পঁচিশটি ছোট ছোটগ্লাসে সাজানো রয়েছে এই অমৃত -পর্যটকদের আস্বাদ গ্রহণের জন্য। আবার এব্যাপারে

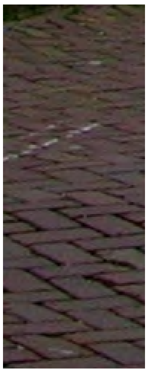

কোনও লাগামও নেই, পান করা যাবে যত ইচ্ছাই। একবার সাজিয়ে রাখা একটি ছোট গ্লাস পান করলে ইচ্ছে করবে সবকটি গ্লাসেরই রসসুধা পান করতে। আবার ফ্যাক্টরি থেকে বেশ কম দামে কিনেও নেওয়া যায় নানারকমের ওয়াইনের বোতল।

ভলেনডামে ন -দশ রকমের চিজ তৈরি হয়। এদের মধ্যে সবথেকে বিখ্যাত 'গাউডা চিজ', যা অত্যন্ত সুস্বাদু। কীভাবে চিজ তৈরি হচ্ছে তা দেখতে গিয়ে টুকটাক রসনাতৃপ্তি করেছি সদ্যোজাত চিজের টুকরো মুখে দিয়ে।

আমরা যে বছর ভলেনডাম বেড়াতে গিয়েছিলাম সেবার সেখানে "রেমব্রান্ট ৪০০" পালিত হচ্ছিল। বিখ্যাত শিল্পী রেমব্রান্টের চারশত জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হচ্ছিল সারা দেশ জুড়েই। সমগ্র নেদারল্যান্ডস-এ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সবকটি শহরেই প্রদর্শিত হচ্ছিল রেমব্রান্টের আঁকা বিভিন্ন ছবিগুলি। প্রদর্শনী চলেছিল সারাবছর ধরেই। আমরা সৌভাগ্যক্রমে সেইসময়ে শিল্পীর আঁকা বেশ কিছু ছবি দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম।

সারভান্তেসের লেখা বিখ্যাত চরিত্র ডন কুইকজোটকে কে না চেনে! ডন কুইকজোট -যে নাকি ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে বিখ্যাত আর তেড়ে যেত উইন্ডমিলগুলোর দিকে -তার কাল্পনিক শত্রুদের সঙ্গে মোকাবিলা করবার জন্য। ভলেনডাম গ্রামে সেই উইন্ডমিল সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। সারি সারি উইন্ডমিল একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে আর হাওয়ার তালে তালে ঘুরছে মাথার ওপরে পাখাগুলো। আমরা প্রথম উইন্ডমিলটা দেখে ঠিক ডন কুইকজোটের মতোই দৌড়ে গেছি উত্তেজনার বশে -তবে শত্রু ভেবে ঢাল -তরোয়াল নিয়ে নয় -ডিজিটাল ক্যামেরা হাতে -ছবি তোলার আনন্দে।

ভলেনডামে সামুদ্রিক মাছভাজা আর সামুদ্রিক নানান খাবার খেয়ে কোথা দিয়ে যে তিনটে দিন কেটে গেল টেরই পেলাম না। নেদারল্যান্ডস-এর আরেক শহরে পাড়ি দেওয়ার আগের দিন রাতে হোটেলের ঘরে বসে গাউডা চিজ খেতে খেতে আর ডাচ ফ্রুট ওয়াইনে চুমুক দিতে দিতে মনের মধ্যে ফিরে ফিরে আসছিল এই তিনদিনের মনোমুগ্ধকর স্মৃতিগুলো। আজকে, দীর্ঘ চার বছর পরেও বারবারই মনে পড়ে যায় ভলেনডাম গ্রামের কথা। মানসচক্ষে ভেসে ওঠে সরলতা আর মায়ামাখানো গ্রামটির ছবি -যেখানে হয়তো আজও ক্লগস পায়ে দিয়ে কৃষক নারী তাঁর শিশুকে পিঠে বেঁধে মাঠে কাজ করে চলেছেন আর গুনগুন করে গাইছেন ডাচ ভাষায় কোনও এক গ্রাম্য গানের কলি।

~ তথ্য- ভলেনডাম ~ || ~ ভলেনডামের ছবি ~

www.amaderchhuti.com

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য এবং ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রী মহুয়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছোট গল্প ও ভ্রমণকাহিনী লেখেন।

Rate This : - select -
Total Votes : 2
Average : 2.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

Post Comments

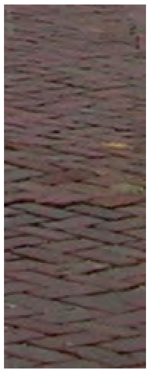

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu

বেড়িয়ে এসে আপনার অভিজ্ঞতাগুলো যেমনভাবে শেয়ার করতে চান কাছের মানুষদের সাথে - ঠিক তেমনি করেই সেই কথাগুলো ছোট্ট করে লিখে পাঠিয়ে দিন ছুটির আড্ডায়। ছয় থেকে ছেষট্টি আমরা সবাই কিন্তু এই ছুটির আড্ডার বন্ধু। লেখা ডাকে বা নির্দিষ্ট ফর্মে মেল করে পাঠালেই চলবে। লেখা পাঠাতে কোনরকম অসুবিধা হলে ই-মেল করুন - amaderchhuti@gmail.com

শুশুনিয়া পাহাড় আর এক টেনিদার গল্প

তীর্থঙ্কর ঘোষ

|| তথ্য - শুশুনিয়া ||

বর্ষাকাল হলে কী হবে, ছিটেফোঁটা বৃষ্টিরও লক্ষণ নেই, বরং বেশ গরম। সকাল দশটা বাজে, কলকাতা থেকে ট্রেনে ছাতনা এসে পৌঁছেছি। ছাতনায় চণ্ডীদাসের নামে একটা কলেজ হয়েছে -বড়ু চণ্ডীদাস মহাবিদ্যালয় -বাইরে থেকেই ঘুরে দেখলাম। একটুক্ষণ আশপাশটা ঘুরে নিয়ে এক কাপ চা খেয়ে শুশুনিয়া মোড় থেকে ট্রেকারে রওনা -সবুজ জঙ্গলে ঘেরা পথে মিনিট পনেরো-কুড়ি - তিন মাথার মোড়ে।

তিনমাথার মোড় থেকেই ডানদিকের সরু রাস্তাটা চলে গেছে একেবারে শুশুনিয়া পাহাড়ের নীচে যেখানে ঝরনার জলটা এসে পড়েছে। মোড়ের মাথায় বেশ কয়েকটা ঝুপড়ি দোকান আছে। ঠিক বাঁহাতেরটাই ঝড়ুদার দোকান। ঝড়ুদার সঙ্গে ফোনে কথা বলাই ছিল, দোকানে গিয়ে বলতেই সোজা পাঠিয়ে দিল গ্রিন লজে। এখানে থাকার জায়গা মোটে তিনটে - কোলে বাংলো, রামকৃষ্ণ লজ আর এই গ্রিন লজ। গ্রিন লজে পৌঁছে খোঁজ নিয়ে দেখি পুরো লজটাই ফাঁকা, কোনও বোর্ডারতো নেই-ই, নাইটগার্ডও পালিয়েছে। আমি রাতে থাকব শুনে ম্যানেজার একটু কিন্তু-কিন্তু করছেন -রাতে তাঁরও বাড়িতে নাকি কীসব কাজ আছে। ঝড়ুদাকে আবার ফোন করতেই মুশকিল আসান -ম্যানেজারকে বলে দিল, চাবিটা ওকে দিয়ে দিন।

মোড়ের মাথায় একটা ঝুপড়িতে খেয়ে, লজের কেয়ারটেকার ছেলেটার সাইকেলটা ম্যানেজ করে দুপুরে বেরিয়ে পড়লাম। ছেলেটো পাশের গ্রামেই থাকে। গ্রিন লজের পাশ দিয়ে চার -পাঁচ কিলোমিটার নীচে নেমে, শুশুনিয়া গ্রাম। গ্রামটায় কয়েক হাজার লোকের বাস। একটা হাইস্কুল আছে, লাইব্রেরি আছে, ব্যাঙ্ক আছে। একটুক্ষণ ঘুরে বেড়িয়ে আবার তিনমাথার মোড়ে ফেরত এলাম। ট্রেকারটা ছাতনা থেকে এসে সোজা গেলে যেদিকে যেত সেইদিকে আরেকটু এগিয়ে বাঁহাতে একটা রাস্তা চলে গেছে হুকুমিয়া গ্রামের দিকে। দু'পাশে সুন্দর শালের জঙ্গল। দশ-পনেরো দিন টানা বৃষ্টি হয়নি, তবু বর্ষাকালতো, চারদিকটায় কেমন একটা সবুজ সবুজ ভাব, বেশ ভালো লাগছিল। ওই রাস্তাটা ধরে কয়েক কিলোমিটার এগোলাম, গ্রাম পর্যন্ত আর যাইনি। ফিরে এসে সাইকেলটা ফেরত দিয়ে এক কাপ চা খেয়ে ফের হাঁটতে হাঁটতে এসে শুশুনিয়া পাহাড়টার তলায় বসে রইলাম অনেকক্ষণ। কাল ভোর ভোর বেরিয়ে পাহাড়টায় উঠব ঠিক করলাম। সন্ধে সাতটা নাগাদ যখন ফিরছি তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। ফেরার সময় একটা দোকানে রাতের খাবারের কথা বলতেই বলল ঠিকাছে সাড়ে ন'টা নাগাদ চলে আসুন, খাবার রেডি হয়ে যাবে।

www.amaderchhuti.com

লজে ফিরতেই দেখি নিশ্ছিদ্র অন্ধকার -লোডশেডিং। কোনও লোক নেই, আলো নেই, গরম আর মশা -খানিক্ষণ এই বীভৎস অবস্থাটায় কাটিয়ে, দুত্তোর বলে চাবি লাগিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লাম। পাশে একটা দোকান থেকে টর্চ কিনে নিয়ে ছাতনার দিকের রাস্তাটা ধরে হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা নীচে নেমে এলাম। চারদিক ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, মাঝে মাঝে টর্চ জ্বেলে দেখে নিচ্ছি আর তারপরেই মনে হচ্ছে অন্ধকারটা যেন আরও চেপে বসছে। দেখতে দেখতে সাড়ে ন'টা বাজল। খেয়ে নিয়ে খানিকক্ষণ বাইরে বসে রইলাম। রাস্তায় কুকুরগুলো চ্যাঁচামেচি করছে। স্থানীয় লোকজন কেউ কেউ বাইরেই চাদরমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছে। তীব্র অন্ধকার আর নিস্তব্ধতাকে ভেঙে দিয়ে একটা ট্রেকার চলে গেল। তার আলোটা চোখ একেবারে ধাঁধিয়ে দিচ্ছিল। লজে ফিরে কিছুক্ষণ ছাদে কাটিয়ে আলো এলে নীচে নেমে এলাম।

পরদিন বেশ ভোরে ঘুম ভেঙে গেল। সাড়ে পাচঁটা বাজে। মুখ হাত ধুয়ে বেরিয়ে পড়লাম। মোড়ে এসে দেখি একটা ঝুপড়ি দোকান খুলেছে। চা খেয়ে এগোলাম পাহাড়ের দিকে। পাহাড়ের পায়ের কাছে যেখানে ঝরনাটা এসে পড়েছে তার পাশ দিয়ে একটা পায়ে চলার পথ উঠছে উপরে। স্থানীয় মানুষজন এই ঝরনার জলও পান করে। এটা নাকি বেশ উপকারীও, নানারকম মিনারেলস্ আছে। ঝরনার আশেপাশে কয়েকটা দোকান আছে। এখানকার বাসিন্দারা পাথর কেটে নানান জিনিসপত্র তৈরি করেন, তারই সব দোকান। তিনমাথার মোড়ের কাছেও এরকম বেশ কয়েকটা দোকান আছে। তবে হুকুমিয়া গ্রামের কাছে শিলালিপি গ্রামে গেলে কারিগরদের কাজ একেবারে সামনে বসেই দেখা যায়।

পাহাড় তো নয়, গাছপালায় ছাওয়া বড়সড় একটা টিলা। নানারকম পাখির ডাক শুনতে শুনতে আঁকাবাঁকাপথে ওপরে উঠছি।অর্ধেকটার কিছুটা ওপরে উঠে দেখি পায়ে চলার পথটা শেষ হয়ে গেছে, আন্দাজে আন্দাজেই উঠতে লাগলাম। পাহাড়ের একবারে মাথায় একটা ছোটমতো শিবমন্দির আছে। ঠিক ওপরে ওঠার আগেই একটা ঘনজঙ্গল। জঙ্গলটায় সবে ঢুকেছি। দেখি কীসের একটা খচখচ আওয়াজ হচ্ছে। ওঠার সময় মাঝেমধ্যে দুয়েকটা কাটা গাছ চোখে পড়েছিল ভাবলাম কেউ হয়তো কাঠ-টাঠ কাটতে এসেছে। নির্জন জঙ্গলে আওয়াজটা বেশ অদ্ভুত লাগছিল। 'কে, কে' করে চেঁচিয়ে উঠতেই আওয়াজটা থেমে গেল। কয়েক সেকেন্ড থেমে গিয়েই ফের শুরুহল। চারপাশে তাকিয়ে দেখি গাছের ডালে বেশ বড় বড় আমলকির মতো ফল ঝুলছে। তারই একটা ছিঁড়ে নিয়ে ছুঁড়তেই কুরুক্ষেত্র কাণ্ড শুরু হল। উঁচু উঁচু গাছ -মাথার ওপরে ধুপধাপ ভয়ানক আওয়াজ। তাকিয়ে দেখি কতগুলো প্রমাণ সাইজের হনুমান একগাছ থেকে অন্যগাছে লাফাচ্ছে। আমার মাথার উপরে গাছের ডালে বসে ওরা এতক্ষণ ফল খাচ্ছিল। আমি ফলটা ছুঁড়তেই ভীষণ একটা গোলযোগ বেঁধে গেছে। হঠাৎ নজরে পড়ল একটা হনুমান কিন্তু লেজটাকে গাছের ডালে জড়িয়ে রেখে দিব্যি ফল খেয়ে যাচ্ছে। এত কাণ্ডে ঘাবড়ায়নিতো বটেই উলটে আমার চোখে চোখ পড়তেই দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে আসার ভঙ্গী করছে। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখলাম,

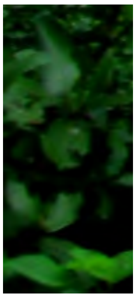

তারপর জঙ্গল থেকে একটু নেমে এসে ডানদিক দিয়ে পাহাড়ের মাথায় উঠলাম।
পাহাড়ের মাথায় গাছের ছায়ায় বসে আছি। নীচে তাকিয়ে দেখি সূর্য উঠে গেছে। জঙ্গল আর পাহাড়ের মাথায় কিন্তু রোদের আলো পৌঁছোচ্ছেনা। বেশ খানিক্ষণ পরে আস্তে আস্তে নীচে নেমে এলাম। ফিরে এসে লজের ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করি, পাহাড়ের উপরে জঙ্গলে হনুমান আছে? ম্যানেজারের নির্বিকার উত্তর, শুধু হনুমান কেন বুনো শুয়োরও আছে।
ভাগ্যিস!

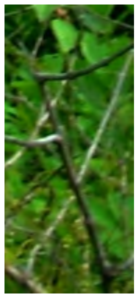

নামী তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার উচ্চপদে কর্মরত তীর্থঙ্কর কাজের ফাঁকে সময় পেলেই কাঁধে ঝোলা ফেলে বেরিয়ে পড়তে ভালোবাসেন।

Rate This : - select -
Total Votes : 1
Average : 1.00

Like 6 people like this.

tell a Friend

ভাসছি রঙিন ক্যানভাসে

নীলাঞ্জন কুণ্ডু

|| তথ্য - গাদিয়াড়া ||

ডায়মন্ডহারবার লোকাল। সকালের চা গরম, কিছু নিত্যযাত্রীর হাসি-তামাসা, বাদাম ভাজা, খোলা মাঠ আর নীল আকাশ দেখতে দেখতে ছুটতে লাগলাম ডায়মন্ডহারবার। নিকোটিনে ভরা শহুরে ফুসফুস ক্রমশ চাঙ্গা হচ্ছে। মনে হল সব পিছু ফেলে এলাম। এসব ভাবতে ভাবতেই পৌঁছে গেলাম ডায়মন্ডহারবার স্টেশন। জনবহুল মফঃস্বল। টিকিট কাউন্টারের সামনে দিয়ে বড় রাস্তায় পৌঁছেই ভ্যানওয়ালাদের হাঁকডাক শোনা গেল। তাদের হাত এড়িয়ে বাসের অপেক্ষায় দাঁড়াই।
পরবর্তী গন্তব্য নূরপুর। খানিক্ষণের মধ্যেই এসে গেল বাস। উঠে পড়লাম। মিনিট চল্লিশেক ঝাঁকুনি, দুলুনি, খেতে খেতে পৌঁছে গেলাম নূরপুর। এখান থেকে লঞ্চে নদী পেরোলেই গাদিয়াড়া। নদী দেখেই মন নেচে উঠল। এতকাছে এত সুন্দর জায়গা!
অনেকবার ছোটবেলায় এমন ভাবনা তো হয়েইছে। মাস্টারমশাই দিয়েছেন তৈলাক্ত বাঁশে বাঁদরের ওঠানামার হিসাব করতে আর আমার মন সেই বর্ষার দিনে পক্ষিরাজ হতে চাইছে। সেদিন মনে হত ছুটি পেলেই ছুট লাগাবো। কিন্তু লম্বা ছুটি আর কই? তাই একছুটে ঘুরে আসা যায় এমন জায়গাই বড়ো টানে। নদীর অসীম বিস্তৃতি আর লঞ্চের দুলকি চালে চলে এলাম গাদিয়াড়া। লঞ্চঘাটে নেমে ডানদিকে সরকারি লজ আর বাঁদিকে বেশকিছু বেসরকারি খাওয়া ও থাকার জায়গা। যদিও অনেকেই দিনের দিন এসে ফিরে যান। আমার ইচ্ছাও তাই। শহর ছেড়ে দূরে মগ্ন হতে চাইছিলাম আমি। শঙ্খবাবুর কবিতা ধার করে বলি-

www.amaderchhuti.com

মনে হয় পিশাচ পোশাক খুলে পরে নিই
মানব শরীর একবার?

চুপ করে নিজের নির্জনতা খুঁজে নিয়ে সরে এলাম নদীর কাছাকাছি। আমি আর প্রকৃতি। ওপারে আরেকটি চর দেখা যাবে, গেঁওখালি। সেটিও ট্যুরিস্ট স্পট হিসাবে সেজে উঠেছে। কিন্তু এবার পেটে বড় ভুখ - না খেলেই নয়। নদীর পাড়েই একটি পরিষ্কার হোটেল। ঢুকে পড়লাম। ভোজনং যত্রতত্র, শয়নং হট্টমন্দির - এমন আদর্শে বিশ্বাসী না হলে তো আর হুট করে ছুট দেওয়া যায় না। খেয়ে এসে আবার নদী।যদিও এবার তাতে অন্য রং।দুপুর পেরিয়ে বিকেল আসছে।নদী শান্ত হচ্ছে। আকাশ ম্লান হচ্ছে।সূয্যিমামাও পাড়ি দিচ্ছে পশ্চিমের ঘর।
হঠাৎ মনে হল কনে দেখা এই গোধূলি আলোয় যদি নৌবিহার না করি তবে তো অসম্পূর্ণ এ ভ্রমণ। একটি কিশোর মাঝির সঙ্গে রফা করে চড়ে বসলাম। আহা, কী দেখিলাম, জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না! আপামর বাঙালি আজীবন নবকুমারের এই উক্তি মনে রাখবে। আমিও আরেকবার উচ্চারণ করলাম।
সাদা ছেঁড়া গেঞ্জি, হ্যাফপ্যান্ট আর মুখে সরল হাসি নিয়ে আমার নৌকার সারেং আমায় বুঝিয়ে দিচ্ছিল দুই নদীর মিশে যাওয়ার কথা। দুটি রং মিশছে এক পাত্রে। আর তাতে এসে পড়েছে পড়ন্ত সূর্যের আভা। এত রঙিন ক্যানভাসে ভাসমান থাকতে পেরে ধন্য হচ্ছিলাম আমি। কিন্তু সময় তো নদীর মতো প্রবাহমান। তাই ফেরার সময়ও এগিয়ে আসে। আসার সময় গাদিয়াড়া লঞ্চঘাটে নূরপুর ফেরত লঞ্চের সময় জেনে নিয়েছিলাম। ফলে সময়ের সঙ্গে উপভোগ মিলিয়ে নিতে অসুবিধা হল না। আমার তরণীর কিশোর আমায় উপহার দিল তালপাতায় বানানো তার হাতের কাজ। একসঙ্গে চা খেতে খেতে তার সঙ্গে খানিক্ষণ সুখদুঃখের গল্প করলাম। তার অভাবী সংসারের বারমাস্যা ঘোচাতে পারেনি গাদিয়াড়া। কারণ সৌন্দর্য মনের দরজায় নাড়া দেয় পেটের থাবার কাছে সে ঠাঁই পায় না। যাই হোক, অবশেষে চেনাবৃত্তের উদ্দেশে রওনা দিলাম। যে পথে এসেছিলাম সেই পথেই। সঙ্গে থাকল অনন্ত -অপারবিস্তৃত জলরাশি, ঘননিবিড় সবুজের মাঝে নির্জনতার শান্তি আর ডিঙি বাওয়া কিশোরের সরলতামাখা হাসির স্মৃতি।

এই ডাঙা ছেড়ে হায় রূপ কে খুঁজিতে যায় পৃথিবীর পথে।

নীলাঞ্জন পেশায় শিক্ষক।